# রবীন মাষ্টার



ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্‌-এ, ডি-এল্‌

[ সুনীল ঘোষ কর্তৃক সংক্ষেপিত ]

পুঁথিঘর
২২, কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রকাশক—

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

পুথিঘর

২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আশ্বিন ১৩৬২

দাম—দুই টাকা



মুদ্রাকর—

শ্রীঅজিতকুমার কুমার

মিত্র প্রেস,

২নং গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—৬

এযুগের বাঙ্‌লা রসসাহিত্যে নতুন বৈপ্লবিক ভাবধারার প্রবর্ত্তনে যাঁরা পথিকৃৎ শ্রদ্ধেয় ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁদের অন্যতম। "রবীন মাষ্টার" তাঁর বহু প্রশংসিত ও বহু-আলোচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে একটি। মানুষ যখন নতুন কোন সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তখন প্রচলিত ধ্যান ধারণার সঙ্গে তার সংঘাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই সংঘাত ও প্রতিকূল আবহাওয়াতে ভেঙে না পড়ে, আদর্শ নিষ্ঠায় অবিচল থাকলে শেষ অবধি আদর্শের জয় অনিবার্য্য—এই শাশ্বত সত্যকেই বর্ত্তমান কাহিনীতে লেখক অপূর্ব্ব মুন্সীয়ানার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। একজন সাধারণ শিক্ষক হয়েও অসংখ্য প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে রবীন মাষ্টারের অনমনীয় সংগ্রামের কাহিনী আজকের দিনে আমাদের দেশের কিশোর মনেও গভীর রেখাপাত করবে এবং নতুন যুগের কিশোর কিশোরীদের চরিত্রগঠনে সাহায্য করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আজ নতুন চিন্তাধারায় এবং কর্ম্মপন্থায় দেশগঠনের যে আয়োজন সুরু হয়েছে—তাতে রবীন মাষ্টারের আদর্শ সমাজের প্রতিফলন মুগ্ধ বিস্ময়ে লক্ষ্য করতে হয়। এই নতুন সমাজ গঠনে কিশোর মনকে প্রস্তুত হতে বর্ত্তমান উপন্যাসটি যথেষ্ট সহায়তা করবে এই আশা নিয়েই রবীন মাষ্টারের কিশোর সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

—প্রকাশক

# রবীন মাষ্টার

১

ছেলে বেলায় বাপ-মা তাকে ডাকত 'খোকা' বলে, বড় হলে সবাই বলত 'রবি ঠাকুর'; কিন্তু আজ দশখানা গ্রামের ছেলে-বুড়ো সবাই জানে 'রবীন মাষ্টার' বলে। আর জানে যে, সে বদ্ধ পাগল।

তিরিশ বৎসর আগে সে বি-এ ফেল করে এসে বসেছিল গাঁয়ে, কেন না পড়বার তার আর সঙ্গতি ছিল না। কিন্তু লোকটা তখন ছিল ভারী উৎসাহী আর বিলক্ষণ জোগাড়ে। কতকগুলি ছেলে সংগ্রহ করে সে করলে একটা মাইনর ইস্কুল। নিজে হল তার হেড-মাষ্টার। লোকে বললে, এ-পাড়াগাঁয় কি ইস্কুল চলবে? মাত্র তিন মাইল দূরে যেখানে একটা এনট্রান্স ইস্কুল রয়েছে! কিন্তু রবীন মাষ্টার দম্‌বার পাত্র নয়। দশটি ছেলে নিয়ে ইস্কুল বসালে। দেখতে দেখতে হয়ে গেল সেখানে একশ' ছেলে।

গাঁয়ের জমিদার ভুবনবাবু দুখানা ঘর আর গোটা পঁচিশেক টাকা দিয়েছিলেন। তাই সম্বল করে রবীন মাষ্টার নিজের খাটুনী আর উৎসাহের জোরে রীতিমত একটা জমজমাট ইস্কুল করে ফেললে।

তারপর সে করলে বিয়ে। বিয়ে সে আগে করে নি, কেন না বউ এনে খাওয়াবার সঙ্গতি ছিল না। যখন তিরিশ টাকা মাইনে

সত্যি সত্যি হাতে আসতে লাগল, তখন সে ভাবলে, এখন বিয়ে করা যায়।

তারপর তার ঝোঁক চাপল, মাইনর ইস্কুলটাকে হাই স্কুল করতে হবে। ভুবনবাবুর কাছে অনেকদিন দরবার করে দু'খানা টিনের ঘর উঠল—পত্তন হ'ল 'ভুবনমোহন হাই স্কুলে'র।

সে কি হাঙ্গামা! ছেলে জুটিয়ে আনা, টাকা ভিক্ষে করা, বই জোগাড় করা, ইনস্পেক্টরের অফিসে দরবার করা—সব করলে রবীন মাষ্টার একা।

বছর দুই বাদে যখন ইস্কুলটা বেশ চলতে লাগল, তখন ইনস্পেক্টর এক লম্বা ফর্দ্দ দিয়ে বললেন, একটা কমিটি করতে হবে, গ্রাজুয়েট হেড মাষ্টার চাই, মাষ্টার বাড়াতে হবে, বই কিনতে হবে—এমনি কত কি!

রবীন মাষ্টার খেটে খুটে সব জোগাড় করলে। হল কমিটি।

নতুন মাষ্টারের জন্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। দরখাস্ত এল অনেক এম-এ, বি-এর কাছ থেকে! কমিটি থেকে বাছাই করতে অসুবিধা হল। তাঁরা সব দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলেন ইনস্পেক্টরের কাছে। ইনস্পেক্টর বাছাই করে ফেরত পাঠালেন।

একজন এম-এ-কে তিনি করলেন হেড মাষ্টার, একজন হালের বি-এ হলেন সেকেণ্ড মাষ্টার। রবীন মাষ্টারকে থার্ড মাষ্টার হয়ে থাকতে হুকুম হল। মাইনে সেই তিরিশ টাকা।

ইস্কুলের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল আশে পাশে আর সেই খ্যাতি ষোল আনা রবীন মাষ্টারেরই পাওনা। সে এমন যত্ন করে আর এমন উপায়ে ছেলেদের পড়াত যে, অতি বড় বোকা ছেলেও তরে যেত।

প্রথম যে বারে ইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য ছেলে

পাঠান হল, তখনও রবীন ছিল হেড মাষ্টার। সেই বারেই একটা ছেলে পেলে কুড়ি টাকার সরকারী জলপানী। আর যায় কোথায়? চার দিক থেকে ছেলে ভেঙ্গে আসতে লাগল।

রবীন মাষ্টার যতদিন স্কুল চালাচ্ছিল, ততদিন সে ছেলেদের ইস্কুলে তো পড়াতই, বাড়ী নিয়ে গিয়েও পড়াত। আবার মাঠে-ঘাটে তাদের নিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে কি গুষ্টির মাথা করত তা সেই জানে। নিয়ম-কানুনের ধার সে বড় ধারত না। যখন যে ক্লাসে খুশী ঢুকে যেত। একটা ছেলেকে হয়ত অঙ্কের ঘণ্টায় জিওগ্রাফী পড়াত, আর একটাকে বাঙ্গালার ঘণ্টায় পাঠিয়ে দিত অন্য মাষ্টারের কাছে ইংরাজী পড়তে। এমনি এলোমেলো ছিল তার ব্যবস্থা। মাষ্টারেরা তার এসব ব্যবস্থা বুঝতে পারত না। তারা হাসত আর আপনা-আপনির মধ্যে বলাবলি করত,—বদ্ধ পাগল রবীন মাষ্টার!

নতুন হেড মাষ্টার এলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এল গভর্ণমেণ্টের মোটা টাকা সাহায্য—আর ছককাটা আট-ঘাট বাঁধা আইন-কানুন।

হেড মাষ্টার সেই আইনের খাতা খুলে সব মাষ্টারদের জানিয়ে দিলেন যে, সকলকে ঐ আইন মেনে চলতে হবে।

রবীন মাষ্টারের আস্পর্দ্ধার সীমা নেই। এম-এ পাশ, পাঁচ বছরের অভিজ্ঞ হেড মাষ্টারকে সে অম্লান বদনে বললে, "দেখুন, ওতে অসুবিধা আছে। ওই শচে ঘোষ, ওকে রোজ একঘণ্টা ইংরাজী আর একঘণ্টা ইংরাজী গ্রামার পড়ান মিথ্যে, কেন না যেটা ক্লাশে পড়ান হবে. তার চেয়ে ঢের বেশী ওর জানা আছে। অথচ অঙ্কে সে কাঁচা। তাকে সেই সময় অঙ্কের ক্লাশে বসিয়ে দিলে ঢের ভাল হবে। আর সুরেন ভট্‌চাজ্জি, ওকে সংস্কৃত ক্লাশে বসিয়ে রাখা মিথ্যে। ও মুগ্ধবোধ রঘুবংশ শেষ করে ইস্কুলে ভর্ত্তি হয়েছে। আবার সত্য মিত্তির—"

বি-এ ফেল থার্ড মাষ্টারের এ স্পর্দ্ধায় হেড মাষ্টার মহাবিরক্ত হয়ে বললেন, "না মশায় না। অমন এলোমেলো করে ছেলেদের শেখান চলে না। ইস্কুলের 'ডিসিপ্লিন' তাতে থাকে না। ঠিক আইন মত সব করতে হবে।"

মুখ চূণ করে রবীন মাষ্টার বললে, "হোক।"

বছর খানেক বাদে সেকেণ্ড মাষ্টার হেড মাষ্টারকে গিয়ে বললেন "মশায়, এখানকার মাইনে তো যা—ভেবেছিলাম প্রাইভেট পড়িয়ে কিছু পাব, কিন্তু ঐ রবীন মাষ্টারের জ্বালায় আর কিছু হবার জো নেই। সব ছেলেকে ও বাড়ীতে নিয়ে পড়াচ্ছে অমনি; লোকে প্রাইভেট মাষ্টার রাখবে কেন?"

কথাটা শুনে হেড মাষ্টার একদিন রবীন মাষ্টারের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত। দেখলেন সেখানে এক পাল ছেলে। কেউ বসে ঘুড়ি তৈরী করছে কেউ বাঁশ চিরে দিচ্ছে, আর কয়েকজন চাটাই বানাচ্ছে। খুব ছোট কয়েকটা ছেলে কাগজ কেটে নানা রকম প্যাটার্ণ করছে।

রবীন মাষ্টারের বাহির বাড়ীতে একখানা বড় খড়ো ঘর, আর তার সামনে উঠান। ও-ধারে দু'টো গরু বাঁধা আছে। উঠানে ছেলেরা করছে এই সব। একদল ছেলে দাঁড়িয়ে গরু দেখছে আর কয়েকজন গরু-বাছুরের ছবি আঁকছে।

ঘরের ভিতর পাঁচটা ছেলে বসে পড়ছে। রবীন মাষ্টার দেয়ালে টাঙ্গান একটা ম্যাপের কাছে দাঁড়িয়ে ম্যাপ দেখিয়ে দেখিয়ে ছেলেদের সঙ্গে খুব হাসাহাসি করছে।

হেড মাষ্টারকে দেখে রবীন মাষ্টার ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর একমাত্র চেয়ারখানা ঝেড়ে বসতে দিলে। হেড মাষ্টার মুখ ভার করে উঠানের ছেলেদের দেখিয়ে বললেন, "এরা সব এ কি করছে?"

বিনীতভাবে রবীন মাষ্টার বললে,'একটু কায়িক পরিশ্রম (Manual-training) আর প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ (Nature-study) করাচ্ছি ওদের !"

তখন বি-টি মাষ্টারের যুগ নয়। এ সব জিনিষ হেড মাষ্টারবাবুর জানা ছিল না। তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, "ওদের মাথাটি খাচ্ছেন। এই সব খেলা-ধূলায় যদি মাষ্টারের কাছেও উৎসাহ পায়, তবে কি আর ওরা বই নিয়ে বসবে ?"

রবীন মাষ্টার কয়েকজন বিদেশী শিক্ষাবিদের অতি আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির উল্লেখ করে নিজের পক্ষ সমর্থন করতে যাচ্ছিল। তাদের নাম হেডমাষ্টারের জানা ছিল না। তিনি বললেন, "রেখে দিন ওসব বিলিতি থিওরী। এদেশে ছেলেদের কাণ ধরে বই না পড়ালে ওদের শেখাই হবে না। এতে এদের সবার মাথা খাওয়া হবে। আর এদের আপনি কি পড়াচ্ছেন ? জিওগ্রাফী তো আপনার পড়াবার কথা নয়। আপনি পড়াবেন হিষ্টরী। সুরেন বাবুকে ডিঙ্গিয়ে যদি আপনি জিওগ্রাফী পড়াতে যান, তবে, 'ডিসিপ্লিন' এর কি হবে ?"

বিনীত ভাবে রবীন মাষ্টার বললে, "আজ্ঞে জিওগ্রাফী নয়, হিষ্টরীই ওদের পড়াচ্ছিলাম এখন। ম্যাপ দেখে হিষ্টরী পড়লে অনেক জিনিষ বেশ পাকা হয়ে যায়। ভারতের সাধারণ ইতিহাসটা বেশ সুন্দর বোঝান যায় ম্যাপের সাহায্যে !"

ম্যাপ দেখিয়ে হিষ্টরী পড়ান ! এমন সৃষ্টি-ছাড়া কথা কেউ কখনও শুনেছে ? হেড মাষ্টার ভ্রূকুঞ্চিত করে ম্যাপটা উল্টে দেখে বললেন, "এ তো দেখচি ইস্কুলের ম্যাপ !"

রবীন মাষ্টার বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি রোজ নিয়ে আসি আবার রোজ নিয়ে যাই।"

"কি সর্ব্বনাশ! ইস্কুলের সম্পত্তি আপনি এমনি বাড়ী নিয়ে আসেন?"

"বরারবই তো তাই করছি। এতে দোষ কি?"

"আপনি বরাবর যা করেছেন সে তো দেখতেই পাচ্ছি। ইস্কুল-টাকে করে তুলেছিলেন আপনার ঘরোয়া সম্পত্তি। কিন্তু এসব চলবে না। ওহে ছোকরারা, তোমরা বাড়ী যাও।"

এইবার রবীন মাষ্টার তেতে উঠল। সে বললে, "কখনও না। বরং আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, আমার বাড়ী আমার দুর্গ—এখানে আপনি যদি আসেন সে আমার অনুমতি সাপেক্ষ।"

ম্যাপখানা আগেই জড়িয়ে ফেলেছিল রবীন মাষ্টার। সেটা হেড মাষ্টারের হাতে দিয়ে সে বললে, "এই নিয়ে যান আপনার ইস্কুলের সম্পত্তি। আর বাড়ীতে আমার কাজে হাত দেবেন না।"

এই শান্ত, নিরীহ লোকটির এতটা স্পর্দ্ধা দেখে হেড মাষ্টার অবাক্ হয়ে গেলেন। কি বলবেন ঠিক করতে না পেরে ম্যাপখানা বগলে করে তিনি রাগে কাঁপতে কাঁপতে হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেলেন।

এর পর হেড মাষ্টার আদা-জল খেয়ে লাগলেন রবীন মাষ্টারের পেছনে। গাঁয়ে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল।

ভুবনবাবু ছিলেন ইস্কুল কমিটির প্রেসিডেণ্ট। হেড মাষ্টার তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, "রবীন মাষ্টারকে না ছাড়ালে ইস্কুলের 'ডিসিপ্লিন' থাকবে না।"

ভুবনবাবু যদিও এই দিগ্‌গজ এম-এ-টিকে যথেষ্ট সমীহ করতেন, তবু একথা শুনে তিনি বললেন, "রবীনকে তাড়াবে? তারি এ ইস্কুল। তাকে তাড়াবার তুমি আমি কে হে?"

সতীশ চৌধুরী কমিটির আর একজন সভ্য। তাঁর কাছে গিয়ে

হেড মাষ্টার মৌখিক সহানুভূতি পেলেন, কিন্তু তিনি বুদ্ধিমানের মত বললেন, "ওকে তাড়ালে যদি ও আর একটা ইস্কুল খুলে বসে, আপনার ইস্কুলে ছেলে থাকবে না একটিও।"

নিরুপায় হয়ে হেড মাষ্টার তাঁর মুরব্বী ইনস্পেক্টরকে ধরলেন। তিনি বললেন, "না হে না, ও থাক। বেচারা এত কষ্ট করে ইস্কুলটা করেছে।"

কাজেই রবীন মাষ্টারকে তাড়ান গেল না। কিন্তু নির্য্যাতনের সীমা রইল না তার।

রাগের ঝোঁকে একটা বেতমিজি করে ফেলেছিল রবীন মাষ্টার, কিন্তু ঝগড়া করা তার স্বভাব নয়। তাই হেড মাষ্টারবাবুর সব অত্যাচার সে নীরবে সহ্য করলে। বাড়ীতে ছেলে পড়ান সে ছেড়ে দিলে। শুধু ইস্কুলের ছক্-কাটা রুটিন দেখে নিয়ম বেঁধে পড়াতে লাগল ইতিহাস আর স্বাস্থ্য।

সেই থেকে রবীন মাষ্টার বদলে গেল।

আগে গ্রামে যা কিছু হত তার ভিতর সে-ই মাথা পেতে দিত সবার আগে। এখন সে কোনও কিছুতেই যায় না। চুপ-চাপ ইস্কুলের কাজ করে, আর ঘরে বসে কি যে করে সারাদিন, কেউ খবর রাখে না। তার অসাধারণ কাজের মধ্যে আছে শুধু বছরে দু'বার কলকাতা যাওয়া। পূজোর ছুটি আর গরমের ছুটিতে কলকাতা তার না গেলেই নয়।

কলকাতায় তাকে দেখা যায় শুধু পুরনো বইয়ের দোকানে, আর ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী কিম্বা অন্য কোনও লাইব্রেরীতে। পুরনো বইয়ের দোকানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে সে বই নিয়ে পড়ে, আর নেহাৎ দায় পড়লে এক আধখানা কেনে।

বই কিনে ফেরে সে চোরের মতন। চুপি চুপি বাড়ীতে ঢুকে কোনওমতে বইয়ের পোঁটলা তার বাইরের ঘরে এক কোণায় লুকিয়ে রেখে অন্দর মহলে যায়। এতটা লুকোচুরির হেতুটা খোলসা করে বলা দরকার।

## ২

রবীন মাষ্টার বিয়ে করেছিল একটু বেশী বয়সে। তার স্ত্রী ছিল তখন ছোট।

সতের বছর পার না হতেই নিস্তারিণী তিনটি পুত্র-কন্যা প্রসব করলেন। প্রত্যেকটির সঙ্গে সঙ্গে এল লম্বা কাজের ফর্দ্দ। সৃষ্টি হল আরও অনেক জটিলতা।

ছেলে হবার পর তাদের মানুষ করা নিয়ে একটা সংগ্রাম ঘনীভূত হয়ে উঠল। নিস্তারিণীর ছেলে মানুষ করবার পদ্ধতি খুব সহজ এবং সংক্ষিপ্ত। সময়ে অসময়ে তাদেরকে খাবার দিয়ে বসিয়ে রাখা এবং অবসর সময়ে তাদের পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করা ছাড়া কোনও কিছুর প্রয়োজন সে অনুভব করত না।

ইস্কুল থেকে রবীন গোড়ায়ই শিক্ষা-পদ্ধতির কয়েকখানা বই আনিয়েছিল। তারপর সে পড়তে আরম্ভ করেছিল মনস্তত্ত্বের বই। ইতিহাস পড়ায় বলে সে পড়তে লাগল রাজ্যের ইতিহাসের বই। পড়বার বাতিক বেড়ে বেড়ে সমাজতত্ত্ব আর অর্থনীতিতে এসে জমে গেল। ছেলে হবার সম্ভাবনা হতেই সে নিজের পয়সা খরচ করে আনালে শিশুপালন ও শিক্ষার দু'খানা বই।

ওই সব বই পড়ে পড়ে সে সেইভাবে ছেলেদের মানুষ করবে

স্থির করলে। বলা বাহুল্য, সে পদ্ধতির সঙ্গে সময়ে অসময়ে মুড়ীর কাঠা সামনে দিয়ে বসিয়ে রাখা বা চপেটাঘাত করা একেবারেই খাপ খায় না।

এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে লাগল বচসা। নিস্তারিণী স্পষ্ট করে বলে দিলে, "অত শত আমি পারবনা। আমার ছেলে রাখা পছন্দ না হয়, নিজে কর সব—পোহাও এদের হাঙ্গামা।"

কাজেই রবীন মাষ্টার নিজেই ছেলেদের ভার নিলে। নিস্তারিণী করলে সম্পূর্ণ নন্-কো-অপারেশন—অসহযোগিতা।

ছেলে-পিলে বেড়ে যখন পাচটি হল আর তারপর বড় ছ'টিকে যখন যমের হাতে তুলে দিতে হল—তখন রবীন হাল ছেড়ে দিলে। ছেলেদের মানুষ করবার ভার থেকে সে নিলে ছুটি।

কিন্তু সে ছুটি নিতে চাইলে হয় কি? ছেলেগুলো স্বভাবতই তার নেওটা হয়ে উঠেছিল। মায়ের ধারে-কাছেও তারা যেতে চায় না। তাই কম্‌লি ছাড়ল না। আর নিস্তারিণীও এতদিন গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়িয়ে চট্ করে ছেলেদের ঝক্কি নিজের ঘাড়ে নিতে মোটেই রাজী হলে না। কাজেই রবীন যতই ছেলেদের হাঙ্গামা ছেড়ে তার কাজ করতে চেষ্টা করুক—ছেলেরা তার ঘাড়েই রইল। যদি কখনও তার কাঁধ ছাড়ে, অমনি দেখতে না দেখতে নিস্তারিণী তাদের কুড়িয়ে এনে রবীনের কাছে দিয়ে বলে, "বলি, এদের দু'টোকে রাখ না একটু—অস্থির করে তুললে যে আমায়।"

নিস্তারিণীর কোনও দোষ নেই। সংসারের ভারী ভারী কাজ—তরকারী কোটা, রান্না বাড়া, ঘর ঝাঁট দেওয়া, নেপা পোঁছা, কাঠ শুকানো, ধান শুকানো—এই সবে সে সদা ব্যস্ত। ছেলে দেখবার সময় তার কোথায়? অথচ তার বিবেচনায়, স্বামীটি কোনও কাজই

করে না। শুধু ঘরে বসে নিরর্থক কতকগুলো বই পড়ে, গোটা কয়েক বাইরের ছেলে টেনে এনে হৈ চৈ করে আর টো টো করে বেড়ায়। সব নেহাৎ বাজে কাজ! এমন নিষ্কর্ম্মা মানুষ—ছেলেগুলোকে যদি ধরে তবু তো কাজ হয়।

পঁচিশ বছর বয়স হতে না হতে নিস্তারিণীর শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। সে হয়ে গেল রীতিমত বুড়ী,অস্থিচর্ম্মসার এবং অতিশয় খিটখিটে। খাটা-খুটি তার পক্ষে সম্ভব রইল না। তাই রবীনকে ধরে আনতে হল তার এক দূর সম্পর্কে পিসতুতো বিধবা বোন মাতঙ্গীকে।

তারপর নিস্তারিণী কাজে একেবারে ইস্তফা দিল। যা পারে তাও সে করে না। করবার দরকারই বা কি? মাতঙ্গী আছে। বিধবা মেয়ে, তিন কুলে তার কেউ নেই—সে খাটবে। না খাটবে কেন? নইলে বিধবা হল কেন?

যে সব বিধবা আত্মীয়ার খাবার পরবার নেই, তারা এই করতেই তো আছে। ভগবান দয়া করে এই বিধবাদের যদি না সৃষ্টি করতেন, তবে আমাদের সনাতন হিন্দু-সমাজ চলতই না। এরা দাসীর মত খাটবে, অথচ মাইনে দিতে হবে না। খাবে একবেলা। কালে-ভদ্রে যদি দু'চার আনা পয়সা চায়—কি দরকার তাদের? পেলেই হয়ত অন্যায় কিছু করে বসবে! ডাল ভাত খাও, ছেঁড়া-খোঁড়া যা পাও পর, আর খেটে যাও। এরই জন্যে বিধাতা সমাজের প্রতি দয়া করে তোমাদের বিধবা করেছেন। পুরস্কার? তোমাদের ত্যাগ, সেবা, নিষ্ঠা ও দেবীত্ব নিয়ে খাসা খাসা কবিতা লিখব, প্রবন্ধ লিখব। আর কি চাও?

ঘরের কাজ করে মাতঙ্গী। বাইরের কাজ, ফুট-ফরমাস খাটবার জন্যে আছে রবীন মাষ্টার! কাজেই এর পর নিস্তারিণীর গিন্নীপনা কেবল

হুকুম করায় পর্য্যবসিত হল। সকালে উঠে ঘরের দাওয়ায় বসে সে আরম্ভ করে চেঁচাতে, রাত দুপুরে তার বাইরের ফরমাস শেষ হয়। তারপর ফরমাস চলে সারারাত্রি একা রবীনের উপর।

বিয়ের পর কিছুদিন রবীন নিস্তারিণীকে নিজের মনের ছাঁচে ঢেলে মানুষ করতে চেষ্টা করেছিল। অল্প দিন বাদেই হাল ছেড়ে দিতে হয়। ছেলেপিলে হবার পর নিস্তারিণীকে ডিঙ্গিয়ে সে ছেলে মানুষ করতে চেষ্টা করছিল। সে চেষ্টাও সে ছেড়ে দিলে। এখন সে লাঙুল গুটিয়ে পড়ে থাকে তার বাইরের ঘরে, ইস্কুলে পড়ায় এবং ইস্কুলের দরকারে যতটা প্রয়োজন বাইরে ছুটাছুটি করে। আর দিনেরাতে যখনি ফাঁক পায় বসে বসে পড়ে।

হেড মাষ্টারের কড়া শাসনে যখন সে ছাত্রদের ছেড়ে দিলে তখন হল মহাবিপদ। রবীন মাষ্টার দেখলে তার ছট্-ফটানি মিথ্যে। যত আইডিয়াই থাক, তা নিয়ে কাজ করা তার হবে না। পরকে মানুষ করবার ভার সে নিয়েছিল, কিন্তু সমাজের হুকুম হ'ল যে, কেউ তার হাতে মানুষ হবে না। এখন সে করে কি?

অনেকগুলো আদর্শ নিয়ে সে কাজ আরম্ভ করেছিল। তার ছোট দুনিয়াটাকে রাতারাতি বদলে তার চেয়ে ভাল করবে, এই পণ করে অনেক কিছু কাজে হাত দিয়েছিল সে। সে সব কাজ একটি একটি করে তার হাত-ছাড়া হয়ে গেল।

বাইরের জগতের সঙ্গে মিটে গেল তার সম্পর্ক। তাই তার কর্ম্ম-পিপাসা ছড়িয়ে পড়ল অন্তর জগতে।

যখন সে ইস্কুল খোলে, তখন থেকেই সে পড়তে আরম্ভ করে। নানা বিষয়ের বই পড়তে পড়তে তার পড়ার ক্ষেত্রটা প্রয়োজন ছাড়িয়ে অনেক বেশী দূর প্রসারিত হয়ে পড়েছিল।

তিরিশ থেকে বাড়তে বাড়তে তার মাইনে হল চল্লিশ টাকা। তাতে খোরাক পোষাক চলাই ভার। চলে যে, সে কেবল দু'-চারখানা ক্ষেত আছে বলে। তবু সে তারই ভিতর বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে বই কিনতে লাগল। আর দিনরাত সে পড়ে থাকে সেই বই নিয়ে।

ওই যে ঘরের মধ্যে গোঁজ হয়ে দিনরাত হাত পা ভেঙ্গে নিষ্কর্ম্মা হয়ে পড়ে থাকা, এটা কাজের লোক নিস্তারিণী দু চক্ষে দেখতে পারে না। তাই সে প্রায়ই তাড়া করে এসে রবীনকে শুনিয়ে যায় যে, সমস্ত সংসারের হাঙ্গামা মাথায় করে সে যেখানে খেটে মরছে, সেখানে রবীনের এমনি নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে থাকৃতে লজ্জা করা উচিত!

একদিন এমনি তাড়া করে এসে নিস্তারিণী দেখতে পেলে যে, রবীন পিয়নকে দুটো টাকা দিয়ে কি একটা জিনিষ নিলে। খুলে দেখে—ওমা—ছেঁড়া—খোঁড়া পুরনো দু'খানা বই।

পিত্ত জ্বলে গেল নিস্তারিণীর। কি কষ্টে যে সে সংসার চালায় তা সেই জানে। উনি কি না সেই কষ্টের সংসারের টাকা এমনি করে অপচয় করে বই কেনেন! কি না—পড়বেন! কাজের মত কাজ করবেন না, শুধু পড়বেন।

এমন একটা লম্বা বক্তৃতা শুনে সেদিন জন্মের মত শিক্ষা হয়ে গেল রবীনের। বই পড়া সে ছাড়তে পারলে না, কেনাও সে ছাড়লে না, কিন্তু সব করতে লাগল অতি গোপনে।

তাই সে প্রতি ছুটিতে কলকাতা যায়। দোকানে দোকানে ঘুরে যতদূর পারে বই পড়ে, আর সস্তায় ভাল বই পেলে সামান্য দু'চারখানা কিনে আনে অতি গোপনে, যাতে নিস্তারিণী কিছুতেই জানতে না পারে।

পুরনো বইয়ের দোকানে অনেক সময় অনেক ভাল ভাল বই থাকে। খুঁজে খুঁজে রবীন মাষ্টার সেগুলো পড়ে। ঘণ্টার পর

ঘন্টা সে পড়েই যায়। অনেকদিন দোকানদার ধমকে উঠেছে, "সারা বইখানা এখানে দাঁড়িয়ে পড়বে বাবু? এটা বই পড়বার জায়গা নয়।" মুখখানা কাঁচুমাচু করে অমনি রবীন জিগ্‌গেস করে, "দাম কত?" দাম শুনে মুখ কালি করে বইখানা যথাস্থানে রেখে দেয়। আবার ছুই চার খানা হাত ফিরিয়ে, এদিক ওদিক চেয়ে সেই বই-খানাই তুলে নিয়ে পড়তে থাকে। তারপর তার সাধ্য অনুয়ায়ী অল্পদামে এক আধখানা বই কেনে। পরের দিন আবার যায়। এদিক ওদিক চেয়ে আবার সেই দামী বইখানা টেনে নেয়। এমনি করে পাঁচ সাতদিন ঘুরে সে এক একখানা বড় বড় বই শেষ করে ফেলে। যা পড়ল, ঘরে ফিরে তার চুম্বক করে রাখে।

বইয়ের দোকানে এমনি ঘুরে ঘুরে তার কত না নাকাল হতে হয়েছে। তবু এমন তার বই-ক্ষেপামী যে, সেখানে না গিয়ে পারে না সে। এর জন্তে ঘরে খায় বকুনি. বাইরের লোকে তাকে ঠাট্টা করে, পাগল বলে। ঘরে বাইরে কথা শুনে শুনে ভারী সঙ্কোচ হয় তার। সে পড়ে গোপনে। লোকের সাড়া পেলে বই লুকাবার পথ পায় না —যেন কত বড় অপকর্ম্ম করেছে।

পড়ে সে একটা দিগ্বিজয় করছে—এমন ধারণা তার ছিল না। ভারী পণ্ডিত হয়েছে, এ সন্দেহও তার মনে হয় নি কোনও দিন। শুধু না পড়ে পারত না বলে পড়ত সে। খিদে-তেষ্টার মত ছিল তার এই পাঠ-বুভুক্ষা। এতে করে সে যে অন্ত লোকের চাইতে বড় বা ভাল কিছু কাজ করছে, এ কথা সে ভাবতে পারত না। ভাবত, করছে এমন একটা কাজ যা সবার বিচারে পাগলামী, একটা নিদারুণ অকার্য্য—যেটা কোনও মতে চেপে রাখাটাই সুযুক্তি।

মান-ইজ্জত তার নেই বললেই চলে। ঘরে নিস্তারিণী তাকে যা নয় তাই বলে বকে।

ইস্কুলে হেড মাষ্টার তাকে উঠতে বসতে নাকাল করেন। ছেলেদের সামনে বকাবকি করেন। রবীন মাষ্টার মুখ নীচু করে থাকে। হেড মাষ্টার সরে গেলে সে হেসে ছেলেদের আবার পড়াতে আরম্ভ করে, যেন কিছুই হয় নি।

একদিন একটা কাণ্ড হল।

সেবার কলকাতায় গিয়ে পুরনো দোকানে এক আনায় মার্কসের লেখা একখানা ছেঁড়া বই পেয়ে সে কিনে ফেললে। এই বইয়ে মার্কস্ মানব-সমাজের ক্রম পরিণতির একটা সাধারণ ইতিহাস দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, কেমন করে যুগে যুগে লোক ক্ষুধার তাড়নায় লড়াই করতে করতে সমাজ গঠনের প্রণালী সৃষ্টি ও পরিবর্ত্তন করেছে। বইখানা পড়ে তার তাক লেগে গেল। মনে হল, ভারতের ইতিহাসের ধারাটা তা হলে কি রকম হয়েছে? যে বই সে পড়ায় তাতে মামুলী ভাবে যুগের পর যুগের কথা লেখা হয়েছে, ইতিহাসের বিবর্ত্তনের পরিচয় নেই কিছুই। ভেবে ভেবে সে নিজের মনে ভারতের ইতিহাসের একটা বিবর্ত্তন-ব্যাখ্যা গড়ে ফেললে।

প্রথম শ্রেণীতে ইতিহাস পড়াতে গিয়ে সে ছেলেদের বোঝাতে আরম্ভ করলে তার এই বিবর্ত্তন-বাদ। বোঝাতে বোঝাতে অনেক নূতন কথা তার মনে এল। বেড়েই চলল তার কাহিনী। এমনি করে সে ঝাড়া একমাস ছেলেদের কাছে ভারতের ইতিহাসের হিন্দু যুগের বিবর্ত্তন ব্যাখ্যা করে গেল।

একমাস বাদে সদর নায়েববাবু তাঁর ছেলেকে পড়াতে গিয়ে

দেখলেন যে, এই একমাসের মধ্যে হিষ্টরী বইয়ের এক পাতাও পড়ান হয় নি।

তেড়ে মেরে তিনি হেড মাষ্টারের কাছে গেলেন।

হেড মাষ্টার একখানা খাতা করেছিলেন। তার ভিতর কোন্ দিন কোন্ মাষ্টার কোন্ বইয়ের ক'পাতা পড়ালেন, তা লেখবার নিয়ম ছিল। কথা ছিল, রোজ হেড মাষ্টার দেখবেন সে খাতা, কিন্তু তিনি দেখতেন না মোটেই। এখন সদর নায়েববাবুর এই আক্রমণের ফলে খাতাখানা টেনে নিয়ে দেখে তাঁর চক্ষু স্থির। এ একমাস রবীন মাষ্টার লিখেছেন শুধু "general lecture" অর্থাৎ যাকে বাঙলায় বলে পাঠের ভূমিকা।

খেলে যা! এক মাস বাদে কোয়ার্টারলি। তাতে সমস্ত হিন্দু পিরিয়ডের পরীক্ষা হবে। এতদিন এক পাতাও বই পড়লে না ছেলেরা!

রবীন মাষ্টারের তলব হল। হেড মাষ্টারবাবু তাকে এমন ঝাড়ন ঝেড়ে দিলেন যে অন্য মাষ্টার হলে না খেতে পেলেও চাকরী ছেড়ে দিত। রবীন মাষ্টার শুধু কালির মত মুখ করে ক্লাসে গিয়ে বললে, "হঁ্যা, এইবারে অশোকের চ্যাপ্টার—অশোক হলেন কে? চন্দ্রগুপ্তের ছেলে বিন্দুসার, তার ছেলে অশোক"—ইত্যাদি। ইতিহাসের বিবর্ত্তন ব্যাখ্যা ক্লাসে আর শোনা গেল না।

ফল কথা, অপমান হজম করবার অসামান্য শক্তি ছিল এই লোকটার। খুব বেশী অপমান হলে সে মাথা নীচু করে ঢোকে গিয়ে তার বইয়ের ঘরে আর সেখানে পড়তে পড়তে সব ভুলে যায়।

এমনি দিন যায় তার। চুলগুলো পেকে উঠল। সেগুলিতে চিরুণী লাগাবার কোন বালাই ছিল না। পরণের কাপড় তার একে খাটো, তায় দারুণ ময়লা। স্কুলে যাবার সময় পরে যেত একটা

চেক ছিটের পিরাণ। তার আবার অর্দ্ধেক বোতাম নেই। আর কাঁধে ফেলে যেত পাট করা একখানা চাদর। চটী জুতো একজোড়া কখনও থাকত কখনও থাকত না। পেটেও ভাত যে সব দিন নিয়ম করে থাকত এমন নয়, কেন না, অনেক দিনই নিস্তারিণীর রান্নার দেরী হয়ে যেত। সেদিন না খেয়েই বেরুতে হত তাকে।

৩

দিনে দিনে খ্যাতি তার বেড়েই গেল। দশ বিশখানা গ্রামের যে কেউ তাকে দেখলেই এক ডাকে বলে দিতে পারত, এ সেই পাগলা মাষ্টার!

অনেক বছর আগে যে এই পাগলা মাষ্টারই এই ইস্কুল গড়ে তুলেছিল, সে কথা যারা জানত তারা কতক গেছে মরে, বাদ বাকী লোকে গেছে ভুলে। এখন সবাই জানে যে, সে হল চিরন্তন থার্ড মাষ্টার এবং চিরদিনের পাগল।

দু'একজন লোক এখনও সেকালের রবীন মাষ্টারের কথা একটু মনে করে রেখেছেন। তার মধ্যে ভুবনবাবু একজন।

তিনি বুড়ো হয়েছেন খুব। কাজ-কর্ম্ম কিছু দেখেন না, দেখে তাঁর বড় ছেলে যোগেশ। গাঁয়ের মাথা এখন তিনি নন, যোগেশ। যোগেশের ঘরেই যত দরবার হয়, আড্ডা বসে, গ্রামের পলিটিক্সের চর্চ্চা হয়।

ভুবনবাবু থাকেন সাড়ম্বর পূজা-আহ্নিক ধর্ম্ম-কর্ম্ম আর দাবা নিয়ে।

এই দাবা খেলার জন্য তাঁর দরকার হয় রবীন মাষ্টারকে আর রবীন মাষ্টারের দরকার হয় তাঁকে।

রবীন মাষ্টার আসে। কোনও কথা না বলে চুপ চাপ কুলুঙ্গির উপর থেকে দাবা ব'ড়ে আর ছক নামিয়ে সাজিয়ে বসে ভুবনবাবুর সামনে। খেলা সুরু হয়ে যায়।

যে দিন দাবার বৈঠক বসে, সেদিন আর সময়ের কোনও ঠিকানা থাকে না। খেলেই যায় দুজনে। যখন রবীন মাষ্টার বাড়ী ফেরে, তখন দেখতে পায়, নিস্তারিণী ভাত ঢাকা দিয়ে রেগে টং হয়ে বসে আছে। গালাগালি খেতে খেতে সে কোনও মতে মাথা গুঁজে দুটো খায়—সব দিন খেতে পায়ও না। তারপর তাড়াতাড়ি বাইরের ঘরে গিয়ে বই নিয়ে পড়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

* * * *

ভুবনবাবু খেলছিলেন দাবা।

যোগেশ ঘরে এসে বললে, "বাবা, একটা কথা আছে।"

ভুবনবাবু বললেন, "কি কথা বাবা ?"

যোগেশ বললে, "হেড মাষ্টারবাবু স্কুলের কয়েকটা কথা বলতে এসেছেন।"

ইতিমধ্যে রবীন রাজাকে একপদ সরিয়ে তীব্র দৃষ্টিতে দাবার ছকের দিকে চেয়ে রইল। ভুবনবাবুর আর শোনা হল না। তিনি ব'ড়ে ঠেলে পিলটাকে জোর দিলেন।

তারপর ঠিক তিন চালে ভুবনবাবু মাৎ !

রবীন চুপ চাপ আবার ছক সাজাতে লাগল।

সাজান হয়ে গেলে ভুবনবাবু বললেন, "রেখে দাও হে, ও আর এখন হবে না। মেজাজটা খিঁচড়ে গেছে।"

রবীন মাষ্টার দাবার ছক আর গুটি কুলুঙ্গির উপর তুলে রেখে কাউকে কোনও কথা না বলে ছাতা বগলে করে হন হনিয়ে চলে গেল।

খেলায় হেরে গিয়ে ভুবনবাবুর মেজাজ চটেই ছিল। তিনি যোগেশকে বললেন, "তা যাও, নিয়ে এস তোমার হেড মাষ্টারকে।"

যোগেশ গেল হেড মাষ্টারকে ডাকতে। ভুবনবাবু তাড়াতাড়ি তাঁর মালার থলে হাতে নিয়ে গ্যাট্ হয়ে বসলেন।

হেড মাষ্টার বিনীত ভাবে ঘরে ঢুকে ভুবনবাবুর পায়ের ধুলা নিয়ে তফাতে বসলেন। যোগেশ দাঁড়িয়ে রইল।

ভুবনবাবু বললেন, "কি হে বাপু, তোমার কথাটা কি? তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, ঘাটে পা বাড়িয়ে রয়েছি, তবু তোমরা আমায় দেখছি শান্তি দেবে না। দু'দণ্ড নিশ্চিন্দি হয়ে যে ভগবানের নাম করব তাও যে পারি না দেখি।"

হেড মাষ্টার ঘাড় নেড়ে বললেন, "আপনাকে বিরক্ত করা আমাদের ভারি অন্যায়। আপনার মত লোক, ঋষি বললেই হয়। বিষয়-কর্ম্ম নিয়ে আপনাকে জ্বালাতন করা পাপ। কিন্তু যোগেশবাবু বললেন যে এ কথাটা না কি আপনাকে না বললে চলে না। তাই এলাম। নইলে শুধু আপনার কাছে ধর্ম্মের উপদেশ শুনতে ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে আমি কখনও আসি?"

কতকটা নরম সুরে ভুবনবাবু বললেন, "কিন্তু ব্যাপারটা কি, তাই শুনি? আমার সময় বড় কম, এখনি পূজোয় বস্‌তে হবে, চট্-পট্ বলে ফেল।"

হাত কচলাতে কচলাতে হেড মাষ্টার বললেন, "কথাটা আমাদের রবীনবাবুকে নিয়ে। ওঁকে দিয়ে তো আর কাজ চলছে না।"

"কেন? কি হয়েছে?"

"আজ্ঞে, একে উনি বি-এ ফেল্—"

"বি-এ ফেল তাই কি? সেকালের বি-এ এত সস্তা ছিল না হে বাপু।

সে কালের বি-এ ফেল আজকালকার গণ্ডা গণ্ডা এম-এ পাশের সমান!"

"আজ্ঞে, তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু, কি জানেন, ওঁর মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে।"

ভুবনবাবু উগ্রস্বরে বললেন, "মাথা খারাপ হয়েছে—বটে? খেলে দেখ তো একবাজী দাবা ওর সঙ্গে। টেরটি পাবে কেমন মাথা খারাপ।"

হেড মাষ্টার দিশেহারা হয়ে যোগেশের দিকে চাইলেন। এই উত্তর শুনে তিনি আর হালে পানি পেলেন না।

যোগেশ বললে, "দাবা উনি যতই ভাল খেলুন বাবা, ওঁর মাথার ঠিক নেই।"

ভুবনবাবু খুব চটে বললেন, "দেখ, আর যে-ই বলুক, তুমি ওকথা বল কি করে? ওই রবীন মাষ্টারের কাছে পড়েছ তো তুমি? গুরু হাজার খারাপ হন, শিষ্যের মুখে তার নিন্দা—এত বড় পাপ আর নেই। আমার ছেলে হয়ে তুমি তোমার গুরুকে পাগল বল! কালে কালে ধর্ম্ম দেখছি রসাতলে চলল।"

যোগেশ মুখ লাল করে বসে রইল। বাপের সঙ্গে মুখে মুখে তর্ক করবার ছেলে সে নয়।

তারপর হেড মাষ্টারবাবু এক নতুন চাল চাল্‌লেন। বললেন, "কিন্তু দেখুন, রবীন মাষ্টার যদি বেশী দিন ইস্কুলে থাকেন তবে যাও বা ধর্ম্ম আছে আজকাল, তাও লোপ পাবে। ধর্ম্মকর্ম্মের ছিঁটেফোঁটাও নেই ওঁর। ঠাকুর দেবতাকে কোনও দিন প্রণাম করেন না। এতেই তো ছেলেদের পক্ষে একটা কুদৃষ্টান্ত হয়। তারপর উনি ছেলেদের শেখান এমন সব কথা, যা শুনলে আপনি কাণে হাত দেবেন। হিষ্টরী পড়ান

উনি। ছেলেদের শিখিয়েছেন যে, আমরা না কি সব অনার্য্য! বলেন, সেকালে অনার্য্যেরা ছিল খুব সভ্য আর আর্য্যেরা ছিল অসভ্য! তাদের আরও শিখিয়েছেন যে, ঠাকুর দেবতার পূজা—এ সব বেদে নেই! এমন সব ভয়ানক কথা যদি ছেলেরা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে, তবে তাদের মধ্যে কি আর ধর্ম্ম-টর্ম্ম থাকবে?"

"বটে?"—বলে ভুবনবাবু চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, "তা তোমরা করতে চাও কি?"

হেড মাষ্টার বললেন, "আমি তো কিছু করতে চাই নে কিন্তু আমার ভয় হয় যে, ইন্‌স্পেক্টারবাবু এলে তিনি হয়ত ইউনিভারসিটি থেকে ইস্কুলের নাম কাটিয়ে দেবেন। তাই ভাবছিলাম যে, সামনের বছর থেকে ওঁকে বিদায় ক'রে দিলে হয়।"

ভুবনবাবু গর্জ্জে উঠলেন, "কি! তারই ইস্কুল থেকে বিদেয় করবে তাকে? তুমি কে হে? কে তোমায় জানত? রবীন মাষ্টার না থাকলে পেতে কোথায় এ ইস্কুল? দেখ হে, মাথার উপর এখনও ধর্ম্ম আছেন। এত সইবে না। ওসব হবে টবে না।"

হতাশ হয়ে হেড মাষ্টার উঠলেন। ভুবনবাবু আবার তাঁকে বললেন, "আর শোন, আমি এখন তোমাদের কমিটির কেউ নই। কাজেই আমার কথা হয় তো তোমাদের শোনবার দরকার নেই। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি, রবীন মাষ্টার বেঁচে থাকতে ইস্কুলের সঙ্গে যদি তার সম্পর্কচ্ছেদ হয় তাহলে আমি তার মধ্যে নেই। তোমরা যেখানে পার ইস্কুল সরিয়ে নিয়ে যাও, আমার ও জমি বাড়ী আমি দেব না।"

একথা তিনি বলতে পারতেন, কেন না 'স্কুল কোড' তখনও হয় নি। তাছাড়া জমী-বাড়ী লেখাপড়া করেও তিনি দেন নি। আর সেই জন্যেই ভুবনবাবুর কাছে দরবারের এত গরজ হেড মাষ্টারের।

দরবারে কিছু ফল হল না দেখে হেড মাষ্টার তো বিষণ্ণ মনে চলে গেলেন। কিন্তু সন্ধ্যেবেলায় ভুবনবাবু ডেকে পাঠালেন রবীন মাষ্টারকে। বললেন, "হ্যাঁ হে মাষ্টার, তুমি না কি ঠাকুর দেবতা মান না ?"

রবীন হো হো করে হেসে বললে, "মানি বইকি, এক দেবতা মানি, সে পেট। এর চেয়ে বড় দেবতা নেই। এই পেটের ক্ষিদের তাড়নায় বনের বাঁদর হয়েছে আজ প্রায় জ্যান্ত দেবতা।"

কাণে হাত দিয়ে ভুবনবাবু বললেন, "রাম, রাম, এ সব কথা শুনলেও পাপ।"

"তবে কেন শোনেন ? ছকটা নামিয়ে আনি ?"

ভুবনবাবু মানা করে বললেন, "না, না, ও আজ থাক। বয়েস তো গেল মাষ্টার, এখনও যে এমনি করছ, তোমার যে নরকেও স্থান হবে না।"

"কেমন করে হবে ? কেন না যেটা নেই তাতে স্থানও নেই। আর যদি সত্যিকার নরকের কথা বলেন, সেখানে তো আছিই। দিব্বি স্থান হয়েছে আমার এখানে।"

"শোন, ও সব মস্করা রেখে একটু ভজন পূজন কর।"

"করছিই তো। আমার যিনি দেবতা, তাঁর ভজন পূজন তো করছিই, নইলে ইস্কুল মাষ্টারী করতে যাব কেন ? আর আপনারাই বা তার চেয়ে বেশী কি করছেন ? একটা ঠাকুর খাড়া করে যে ভোগ দিচ্ছেন, সে তো শেষে যাচ্ছে ঐ পেট দেবতার কাছেই।

"কি বল তুমি ? পাগল হলে নাকি ?"

হো হো করে হেসে মাষ্টার বললে, "ঠিক ধরেছেন। বুদ্ধিমানেরা চিরদিনই পাগল। জানেন, নিউটনকে পাগলা গারদে ধরে নেবার জন্তে থানায় খবর দিয়েছিলেন তাঁর পড়শী ?

ভুবনবাবু বুঝলেন, ছেলে মিথ্যা বলে নি। রবীন মাষ্টারের মাথা খারাপই হয়ে গেছে।

বড় দুঃখ হল ভুবনবাবুর। রবীন মাষ্টারকে তিনি ভালবাসতেন। হেড মাষ্টার ও যোগেশকে ধমকে দেবার পর শেষে যদি তাঁকেই স্বীকার করতে হয় যে, রবীন পাগল হয়ে গেছে তবে তাঁকে বড় খেলো হয়ে যেতে হবে। তাই তিনি বললেন, "শোন মাষ্টার, ও সব পাগলামী এখন তাকে তুলে রাখ। নইলে যে দেবতাকে তুমি মান, তাঁর সমূহ বিপদ। পেট চলা কঠিন হবে।"

"কেন ?"

"চাকরী থাকবে না। হেড মাষ্টার আজই এসেছিল আমার কাছে নালিশ করতে। তুমি ঠাকুর দেবতা মান না, ছেলেদের না কি শেখাও যে, আমরা আৰ্য্য নই—অনার্য্যেরা না কি ছিল সভ্য—আর আর্য্যেরা অসভ্য ? বেদে নাকি ঠাকুর দেবতা নেই ? সে বলেছে, এ সব শেখালে চাকরী তোমার রাখা দায় হবে।"

রবীন মাষ্টার চমকে উঠে বললে, "অ্যাঁ ! একথা এতক্ষণ বলেন নি ? তাই তো ! কি করতে হবে বলুন।"

"প্রথমে ঐ ঠাকুর ঘরে গিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করে এস। তারপর রোজ এসে দু'বেলা প্রণাম করবে।"

রবীন মাষ্টার তখনি গিয়ে ঠাকুর ঘরের সামনে প্রণাম করে এল। তারপর বললে, "এ নয় হল। ছেলেদের শেখাব কি ? পৃথিবী চ্যাপ্টা আর সূর্য্য একটা ঠাণ্ডা জিনিষ—এ সবই বলতে রাজী আছি। কিন্তু কেমন করে শেখাই ? যে বই তিনি ছেলেদের পড়াতে দিয়েছেন, তাতেই যে ছাই আছে আমরা অনার্য্য, অনার্য্যেরা ছিল সভ্য।"

"তাই না কি? কি বই সে।"

রবীন মাষ্টার বইয়ের নাম বললে, আর তারপর নামটা লিখে দিলে একখানা কাগজে।

"আচ্ছা, এখন তুমি যাও।"—বলে ভুবনবাবু রবীনকে বিদায় করলেন। দোরের কাছে গিয়ে সে ফিরে এসে বললে, "দেখুন, আজ ঐ যে পিলের কিস্তি দিয়েছিলেন, তারপরে ব'ড়েটা না ঠেলে যদি দাবার কিস্তি দিতেন, তবে মাং হতেন না, খেলাটা চটে যেত।"

ভুবনবাবু বললেন, "আচ্ছা যেত তো যেত, তুমি এখন বাড়ী যাও। মনে থাকে যেন আমার কথা।"

"নিশ্চয়ই"—বলে রবীন মাষ্টার হন্ হন্ করে হেঁটে চলল। একথা অনেকদিন পর্য্যন্ত সত্যি মনে ছিল রবীন মাষ্টারের। ঠাকুর দেবতা দেখলেই সে সবার আগে গিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করত।

ভুবনবাবুর বাড়ীতে থেকে অনেক ছেলে ইস্কুলে পড়ত। তাদের একজনের কাছে সেই হিষ্টরী বই বেরুল। ভুবনবাবু তাকে ডেকে বললেন, "আর্য্য জাতি সম্বন্ধে কোথায় কি আছে দাগ দিয়ে দাও তো।"

তারপর যোগেশকে ডেকে ভুবনবাবু বললেন, "এই বইয়ের এই কটা জায়গা পড়ে মানে কর তো।"

ভুবনবাবু ইংরাজী জানেন না।

যোগেশ পড়ে মানে করে গেল।

ভুবনবাবু বললেন, "তবে? রবীন মাষ্টারের দোষটা কি? হেড মাষ্টার যে বড় গলায় তার নামে বলে গেল, এ কী বই সে পাঠ্য করেছে তার গুষ্টির মাথা?"

"তাই তো। তাই তো!"—বলে যোগেশ চলে গেল।

পরদিন রবীন মাষ্টার ফাষ্ট ক্লাশে হিষ্টরী পড়াচ্ছিল—হুমায়ুনের কথা। দোরের কাছ দিয়ে হেড মাষ্টারকে যেতে দেখে খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "আর্য্যজাতি জগতের শ্রেষ্ঠ জাতি। রাজপুতেরা ছিল আর্য্য, আর আমরা আর্য্য।"

হেড মাষ্টার শুনতে পেয়ে বুঝলেন সব, কিছু বললেন না।

## ৪

সেদিন সকালে রবীন মাষ্টার তার বাইরের ঘরে বসে একেবারে নিবিষ্টমনে একখানা বই পড়ছিল।

বইখানার একটু ইতিহাস আছে। অনেক দিন থেকে তার মনে মার্কস-এর "ক্যাপিটাল" বইখানা পড়বার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। অর্থনীতির বহু বইতে সে এই 'ক্যাপিটালে'র উল্লেখ দেখেছে।

এবারে কলকাতায় গিয়ে হঠাৎ পুরানো একটা বইয়ের দোকানে খুঁজে পেয়েছিল সে এই অমূল্য নিধি। তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। রাস্তার ফুটপাথে সে দোকান। তাতে দুটো কেরোসিনের ডিবে জ্বলেছে। আলো যা হয় তার একশো গুণ হয় ধোঁয়া। বইখানা পেয়েই সে লোভীর মত তুলে নিয়ে পড়তে লাগল।

সেই বিকেল থেকে সে এ দোকানের বই ঘাঁটছে। একখানাও কেনে নি। তাই দোকানদার এসে এক টানে বইখানা কেড়ে নিয়ে গেল। মুখ কাঁচু-মাচু করে সে জিজ্ঞেস করলে, "দাম কত?" দোকানদার বললে, "তিন টাকা।" এক ভল্যুম মাত্র "ক্যাপিটাল"—তারই দাম তিন টাকা! রবীন কি আর ব'লবে? লুব্ধ দৃষ্টিতে শুধু কিছুক্ষণ চেয়ে রইল বইখানার দিকে। তারপর সেখান থেকে চলে গেল।

রবীনের এক পুরানো ছাত্র এই দৃশ্য দূর থেকে দেখতে পেয়েছিল। সে তখন গা ঢাকা দিয়ে বইখানা কিনে নিয়ে গেল। কিন্তু রবীন মাষ্টারকে সে খুঁজে পেলে না পরে।

সেই ছাত্র একটি লোকের হাত দিয়ে তাকে এই বইখানা পাঠিয়ে দিয়েছে।

বইখানা পেয়ে রবীনের এত আনন্দ হল যে, সে অমনি ঘরে ঢুকে পড়তে লেগে গেল।

"ওগো!" "কোথায় তুমি?" "ওগো শুনছ"—অন্দর হতে তারস্বরে এই সব চীৎকার এসে রবীনের কর্ণপটাহে বৃথাই আঘাত করে ফিরল, তার সম্বিতে এতটুকুও ঘা লাগল না।

"বলি, কাণের মাথা কি খেয়ে বসে আছ না কি? চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ফেটে গেল, বাবু মশায় বসে ক্যাতাব পড়ছেন! বলি, এত যে ক্যাতাব পড়লে, কোন্ স্বর্গের দুয়োর খুলে গেল শুনি? মাইনে তো পাও ঐ চল্লিশ টাকা। আর ওই হেড মাষ্টার পায় দেড়শো টাকা। তার বাড়ীতে গিয়ে দেখ কখানা কেতাব আছে। আমি দেখে এয়েছি গুণে—পাঁচখানা। আর সে বই কি সে পড়ে? রাম বল! হেড মাষ্টারগিন্নীকে জিজ্ঞেস করতে সে তো হেসেই খুন। বলে, এতগুলো পাশ দিয়ে এসেছে, আবার পড়বে কি? আর তুমি পড়েই যাচ্ছ, পড়েই যাচ্ছ—মুরোদ তো তবু ঐ চল্লিশ টাকা! এখন একটু দয়া করে উঠবে কি? এত বড় সংসারটা সামলাব, না তোমার ছেলে সামলাব? আর তো কোনও কাজে লাগ না, একটু ধরলেও তো একটা কাজ হয়।"

নিস্তারিণী ঘরে ঢুকে এমনি লম্বা বক্তৃতা করতে করতে রবীন মাষ্টারের কোলে মার্কসের "ক্যাপিটাল" খানার উপরে বসিয়ে দিলে তার

সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্রকে। বইখানা যায় দেখে মহা ব্যস্ত হয়ে রবীন মাষ্টার ছেলেটাকে ঠেলে ফেলে বইখানা বন্ধ করলে। ছেলেটা কেঁদে উঠল।

কাণ্ড দেখে রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠল নিস্তারিণীর। সে বলল, "ও কি হল? ছেলেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে! খুব তো! ইস্, মস্ত বড় লাট হয়েছেন! রাগ দেখাচ্ছেন! বলি, এত রাগটা কিসের শুনি? রসো, তোমার ঐ বই আমি আজ হেঁসেলের উনোনে না ফেলে দিয়েছি তো আমার নাম নয়।"

বলে সে ডাল মাখা হাতে ছোঁ মেরে রবীনের এত সাধের বইখানা তুলে দম দম করে চলে গেল ভিতর বাড়ীতে।

"আহা-হা-হা—কর কি? কর কি? আমার নয় ও বই—শোন—থাম—ও গো—"

ছোট ছেলেটাকে কোলে তুলে রবীন পিছু পিছু ছুটল।

কোথায় যে বইখানা লুকিয়ে রাখলে নিস্তারিণী, তা কেউ জানতে পেলে না।

ইস্কুলের বেলা হয়ে গেছে, আর বসে থাকা চলে না। স্নান আর হল না। ছেলে কোলে করেই হেঁসেলে গিয়ে রবীন ডাকলে, "মাতঙ্গী, ভাত হয়েছে কি?"

অন্য ঘর থেকে মাতঙ্গী বেরিয়ে বললে, "আমি ধান সেদ্ধ করছি দাদা, রাঁধছেন বউ ঠাকরুণ।"

রবীন আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করে তাড়াতাড়ি মাতঙ্গীর কোলে ছেলেটি গছিয়ে কাঁধে চাদর ফেলে দে ছুট।

নিস্তারিণী ডালের বড়ি দিচ্ছিল। নির্ব্বিকার হয়ে উঠোনে বসে সে ডালের বড়িই দিতে লাগল।

বিষণ্ণ এবং ভারাক্রান্ত মনে রবীন মাষ্টার স্কুলে এসে থার্ড ক্লাসে পড়াতে ঢুকল।

উপেন বললে, "স্যার, আজ আকবর পড়াবেন।"

রবীন যেন ঘুম থেকে উঠে বললে, "হাঁ—আচ্ছা। আকবর হুমায়ুনের ছেলে। তার জন্ম হয়েছিল কখন জান? শের শা হুমায়ুনকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন জান তো?"—বলেই থেমে গিয়ে রবীন মাষ্টার বললে, "উঁহু, আমি বলব না। এই প্যারাগ্রাফে আকবরের জন্ম-বৃত্তান্ত আছে। তোমরা সবাই বেশ ভাল করে পড়ে লেখ। আমি দেখব। হাঁ, শোন। যখন যার পড়া শেষ হবে, অমনি হাত তুলবে, আর লিখতে আরম্ভ করবে। বুঝলে? এই গোপাল, তোর ঘড়িটা আমার কাছে রেখে দিয়ে যা, দেখি কে কত তাড়াতাড়ি লিখতে পারে।"

গোপাল যোগেশের ছেলে। তার হাতে হাত-ঘড়ি ছিল! সে সেটা খুলে মাষ্টারের ডেস্কের উপর রেখে দিল। রবীন মাষ্টার ঘড়ি ধরে বসে রইল। যে যখন হাত তুললে, অমনি তার নামের পাশে সময়টা লিখে রাখলে! তারপর সে লেখাগুলো যত্ন করে বাড়ী নিয়ে গেল দেখবে বলে! যাবার সময় ভুল করে গোপালের ঘড়িটাও পকেটে করে নিয়ে গেল।

ঘড়িটার কথা গোপালেরও মনে ছিল না। সে বাড়ী গেলে যোগেশ হঠাৎ লক্ষ্য করলে যে গোপালের হাতে ঘড়ি নেই। তাকে জিজ্ঞেস করতে তারও মুখ শুকিয়ে গেল।

এ নিয়ে মহা হৈ চৈ লাগিয়ে দিলে যোগেশ। রাজ্যি শুদ্ধ লোক লেগে গেল ঘড়ির খোঁজ করতে। একটা ছেলে বললে যে, গোপাল ঘড়ি দিয়েছিল রবীন মাষ্টারকে। সে কথা গোপালেরও তখন মনে পড়ল। যোগেশ তখন ধেয়ে চল্‌ল রবীন মাষ্টারের বাড়ী।

সন্ধ্যেবেলায় আজ রবীনের দাবা খেলার নিমন্ত্রণ ছিল। নিস্তারিণীর কাছে অভ্যাসমত এক মাত্রা গাল খেয়ে সে বাড়ী থেকে বেরিয়েই দেখল লণ্ঠন হাতে জমীদার বাড়ীর খানসামা এসে দাঁড়িয়ে আছে।

রবীন মাষ্টার বললে, "চল বাবা যাচ্ছি—বড্ড দেরী হয়ে গেছে—চল—"

হঠাৎ নজরে পড়ল তার পেছনে যোগেশ ও আর চার পাঁচজন লোক এসেছে।

রবীন ব্যস্ত হয়ে উঠল। তার বাহির বাড়ীর ঘরে লোককে বসতে দেবার জায়গা নেই। তিনঠেঙ্গো এক সাবেক কালের চেয়ার ছিল, সেটাও সম্পূর্ণ অব্যবহার্য্য হয়ে গেছে। আর সে ঘরের তক্তপোষের উপর ছড়ান আছে কেবল গাদা গাদা বই। রবীন মাষ্টারের বিশ বছরের সঞ্চয়।

ওরই মধ্যে যোগেশকে একটুকু জায়গা করে দেবার জন্য রবীন ব্যস্ত হয়ে ছুটল, কিন্তু যোগেশ বেশ পরুষ কণ্ঠে বললে, "বসতে আসি নি মাষ্টার মশায়, জিজ্ঞেস করতে এসেছি গোপালের ঘড়ি কোথায়?"

ঘড়ির বিন্দু-বিসর্গও রবীনের মনে ছিল না। আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "ঘড়ি? সে কি!"

"সে কি? জানেন না? নেবার বেলায় দিব্বি নিয়েছিলেন খুলে।"

রবীন স্তব্ধ বিস্ময়ে হাঁ করে চেয়ে রইল। গোপাল পিছু পিছু এসেছিল। সে বললে, "হ্যাঁ স্যার, সেই একসারসাইজ নেবার সময় আপনি নিয়েছিলেন আমার কাছ থেকে!"

এতক্ষণে রবীনের মনে পড়ল। সে বললে, "ও হো! তাই তো! তারপর? তারপর নিস্ নি তুই? এই মরেছে—গ্যাছে বুঝি সে ঘড়ি। চল একবার ইস্কুলে যাই, খুঁজে দেখি গে।"

রবীনের গায়ে পরা ছিল একটা সেকেলে পিরাণ। বড় গরম বোধ হওয়ায় রবীন সেটা খুলতে গেল আর অমনি টুপ করে জামার বুক পকেট থেকে গড়িয়ে পড়ল সেই ঘড়িটা।

যোগেশ ও গোপাল এক সঙ্গে বলে উঠল, "ওই তো!" রবীন মাষ্টার আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "তাই তো—আমার পকেটে ওটা এল কি করে?" ভ্রূকুটি করে যোগেশ বললে, "যেমন করে আর দশ জনের এসে থাকে।"

ঘড়িটা তুলে নিয়ে যোগেশ দেখলে, বন্ধ হয়ে গেছে আছাড় খেয়ে। তারপর সে যা গালি-গালাজ আরম্ভ করলে সে আর বলবার মত নয়। রবীন মাষ্টার স্তব্ধ পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। হট্টগোল শুনে নিস্তারিণী আড়াল থেকে একবার উঁকি মেরে বেরিয়ে এল।

যোগেশকে সে জিজ্ঞেস করলে, "কি হয়েছে বাবা?"

যোগেশ খুব চড়া সুরে বললে, "হয়েছে? হবে আবার কি? হয়েছে চুরী। আপনার স্বামী আমার ছেলের ঘড়ি চুরি করেছেন!"

নিস্তারিণী বললে, "ছি যোগেশ, তোমার মুখে একথা! উনি যে কত যত্ন করে তোমায় লেখা-পড়া শিখিয়েছেন বাবা!"

"শিখিয়েছেন তো মাথা কিনেছেন! তাই বলে চোরকে চোর বলব না?"

নিস্তারিণী এবার তেতে বললে, "না, বলবে না। বলতে হয় বল গে তোমার বাড়ীতে, এখানে নয়। বাড়ীতে বসে তুমি তোমার বাপকে চোর বললেও আমি বলতে যাব না। কিন্তু আমার বাড়ী বসে আমার সোয়ামীকে যা তা বলে যাবে—এত বড় বাপের বেটা তুমি নও। বেরোও শীগ্‌গির বাড়ী থেকে।"

যোগেশ পাল্টা জবাব দিল। কিন্তু নিস্তারিণীর সঙ্গে সে পারবে কোত্থেকে? কিছুক্ষণের মধ্যেই রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাল।

নিস্তারিণীর একটা মস্ত জোর ছিল—যোগেশের বাপের জমিতে তার বাড়ী নয়। বাড়ী আর জমি যা আছে সে তাদের লাখেরাজ।

সবাই চলে যাবার পর রবীন মাষ্টার অনেকক্ষণ তেমনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এইটুকু তার বাকী ছিল। পঞ্চাশ বছরের জীবনে পাগল, বেকুব, অকর্ম্মণ্য, মূর্খ—অনেক কিছু লোকে তাকে বলেছে কিন্তু কেউ কোনও দিন অসৎ বলে নি। এ ঘা-টা যেন রবীন কিছুতেই সইতে পারলে না। যে যোগেশকে এই সেদিন রবীন মাষ্টার এত আদর-যত্ন করে লেখাপড়া শিখিয়েছে, সেই কিনা তাকে এমন অপমান করল!

তার সহিষ্ণুতার সীমা ছিল না কিন্তু এবার যেন সীমায় এসে ঠেকেছে মনে হল।

গোঁজ হয়ে বসে সমস্ত জীবনটা উল্টো-পাল্টা ক'রে ভাবলে রবীন মাষ্টার। এতটা ব্যর্থ, এত পরিপূর্ণরূপে অসার্থক মনে হল নিজেকে যে, সে সত্যি সত্যি ভাবতে লাগলো—একে আর টেনে বয়ে লাভ কি? যত ব্যর্থ বঞ্চিত আশা, যত দুঃখ, যত লাঞ্ছনা সব পুঞ্জীভূত হয়ে তাকে তিল তিল করে পোড়াতে লাগল।

অতীতের রিক্ততা ও ভবিষ্যতের শূন্যতা নিয়ে তার দৈন্যভরা জীবন যেন অট্টহাসিতে তাকে উপহাস করে গেল। কোনও কিছুতেই আর তার আসক্তি রইলো না। মনে হল এই শেষ অপমানের পর তার আর বেঁচে থাকবার কোনও মানে নেই।

তার বার বছরের ছেলে শৈল পা টিপে টিপে সেই অন্ধকার ঘরের

ভিতর চুপি চুপি বাপের কাছে গিয়ে হাতে একখানা বই দিয়ে বললে, "মাকে লুকিয়ে নিয়ে এয়েছি বাবা !"

বইখানা রবীন হাতে নিল সম্পূর্ণ নিস্পৃহ ভাবে, কিন্তু হাতে বইটা ঠেকতেই সে চমকে উঠলো। তাড়াতাড়ি দেশলাই জেলে পিদিমটা ধরিয়ে সে দেখলে—সেই "ক্যাপিটাল"। বললে, "কোথায় পেলি ?"

শৈল বললে, "মা এটা মাচার উপর চালের ভেতর লুকিয়ে রেখেছিল, পিসিমা চাল নিতে গিয়ে পেয়ে আমায় দিলে।"

হঠাৎ অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তিতে ভরে উঠল রবীনের হৃদয়। পুত্রের নীরব সমবেদনা পিতার চিত্তে এমন একটা আলোড়ন সৃষ্টি করল যে এক মুহূর্ত্তে তার মনের সমস্ত অবসাদ ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ভারমুক্ত মনে সে বেরিয়ে পড়ল বাইরে। পূর্ণিমার রাত, ফুটফুটে জ্যোছনা। তারই ভিতর দিয়ে চলল সে জমিদার বাড়ীর দিকে। আজকের ঘটনার পর সেখানে যাওয়া উচিত কি অনুচিত, সে প্রশ্নও জাগল না তার মনে।

তখন যোগেশের বৈঠকখানায় ইস্কুল-কমিটির মেম্বাররা মিলে রবীন মাষ্টারের কথাই আলোচনা করছিল। তা সে লক্ষ্যও করল না।

ভুবনবাবু চিৎ হয়ে শুয়েছিলেন।

রবীন মাষ্টার ছক নামিয়ে সাজিয়ে বসল। ভুবনবাবু অবাক্ হয়ে গেলেন।

আজ যে কাণ্ডটা হয়ে গেছে তা যোগেশ এসে ভুবনবাবুকে বলে গিয়েছিল। সে কথা শুনে তাঁর বড় দুঃখ হয়েছিল এই ভেবে যে, রবীন মাষ্টারের মাথা নিশ্চয় খারাপ হয়ে গেছে। তা নইলে সে করবে চুরি ! সামান্য পঁচিশ টাকা দামের একটা ঘড়ি ! এ সম্ভবই নয়। এমন দিন গেছে যে, ইচ্ছে করলে রবীন পাঁচ সাত শো টাকা বেমালুম সরাতে পারত !

হুকটা সাজান দেখে তিনি উঠে বসলেন। খেলা চলল। রবীন মাষ্টার কিন্তু আজ খেলায় জুত করতে পারলে না কিছুতেই। ভুবনবাবু ভাবলেন, আজকের কাণ্ডটায় তার মন খারাপ আছে, তাই খেলা জমছে না। দু-দান খেলে তিনি খেলা ছেড়ে দিয়ে বললেন, "রবীন মাষ্টার, আমিও বুড়ো হয়েছি, তোমারই বা বয়স এমন কি কম? চল দুজনে কাশীবাস করি গে।"

রবীন বললে, "কাশীর জলবায়ু শুনেছি ভাল। কিন্তু বাস যদি কোথাও করতে হয়, সে জায়গা কলকাতা! ওঃ, সেখানে যে কদিন থাকি, কি সুখেই কাটে সারাদিন!"

"এত ভাল লাগে যদি কলকাতা, তবে কোনও দিন সেখানে চাকরীর চেষ্টা করলে না কেন? চেষ্টা করলে কি আর পেতে না?"

"আরে ধেৎ, কলকাতায় কি আমার মত লোকের চাকরী হয়? কলকাতার ইস্কুলে যারা মাষ্টার, তারা নিশ্চয় দিগ্‌গজ পণ্ডিত সব। কত বই তারা পড়তে পায়। আমার মত বিদ্যে নিয়ে কলকাতায় মাষ্টারী করা চলে? ওরে বাপ রে! সেখানে গলিতে গলিতে আমার মত মাষ্টার গড়াগড়ি যাচ্ছে!"

কলকাতা সম্বন্ধে রবীনের এমনি একটা অদ্ভুত আদর্শবাদ ছিল, কেন না, কলকাতা বলতে সে বুঝত 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী', 'এসিয়াটিক সোসাইটি', আর পুরনো বইয়ের দোকান। তা ছাড়া কলকাতার সঙ্গে বলতে গেলে তার পরিচয় মোটেই ছিল না। আর নিজের মূল্যটা রবীন মাষ্টার মোটেই জানত না। তার ওই যে বি-এ ফেলের ছাপ, সেইটে যেন চিরজন্মের মত তার মনটাকে পঙ্গু করে দিয়েছিল। এত পড়ে শুনেও সে যে সেই বি-এ ফেল ছাড়া আর কিছু হয়েছে, একথা তার মনে ওঠে নি একদিনও। পড়ে পড়ে তার

জ্ঞান-বুদ্ধি কেবল—স্তূপীকৃত হয়েছে তার মনের ভিতর। সে বিদ্যা-বুদ্ধির ওজন করে নিজের পরিমাপ করবার কথা তার মনেই ওঠে নি কোনও দিন।

আরও কিছুক্ষণ এ-কথা সে-কথার পর রবীন মাষ্টার বাড়ীর পথে পা বাড়াল।

সতীশ চৌধুরী তখন বাড়ী ফিরছিলেন। হেড মাষ্টারের প্রচুর উৎসাহ এবং যোগেশের তীব্র বক্তৃতা সত্ত্বেও তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলেন না যে, রবীন মাষ্টার চুরী করেছে। বললেন, "নিশ্চয় কোনও দুষ্টু ছেলে ঘড়িটা রবীন মাষ্টারের পকেটে ফেলে দিয়েছিল। ও যে তাল-ভোলা, সেটা খুবই সম্ভব।"

সতীশ চৌধুরী বিগড়ে দাঁড়ালেন, ভুবনবাবু তো বিগড়েই আছেন। তাই হেড মাষ্টার রবীন মাষ্টারকে তাড়াবার বিষয়ে নিরুৎসাহ হয়ে পড়লেন। আজকের মত সভা ভঙ্গ হল।

## ৫

বই পড়তে পড়তে আর তাই নিয়ে ভাবতে ভাবতে সমাজের গঠন-প্রণালী ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে এত সব কল্পনা রবীন মাষ্টারের মাথায় ফুটতে লাগল, এত সব সংস্কারের খেয়াল তার হতে লাগল যে, শেষ পর্য্যন্ত সে তার নিষ্কর্ম্ম চিন্তা-বিলাসে আটকে থাকতে পারল না।

সরকারী কৃষিবিভাগ থেকে অনেক বই আর কাগজ আসে ভুবনবাবুর বাড়ীতে। সেগুলো সব জমাই থাকে। রবীন মাষ্টার একদিন সেগুলো সব নিয়ে এল। পড়ে শুনে হিসাব করে সে দেখতে পেলে যে, গ্রামের সবগুলি লোক বেশ সুনিয়ত ভাবে যদি খাটে আর গ্রামের জমি যদি বেশ

সুশৃঙ্খল ভাবে আবাদ করা যায়, তবে কোনও কলকারখানা না এনেও গ্রামের সম্পদ চারগুণ বাড়িয়ে ফেলা যেতে পারে।

তাদের গ্রামে সবাই শুধু ধান আর পাট বোনে। পাটের দাম যখন বেশী ছিল তখন লোকের তাতে বেশ চলত। এখন চলে না। ধান যা জন্মায়, একটু ভাল করে চাষ করলে গ্রামের মাত্র তিন পোয়া জমিতে সে ধান অনায়াসে পাওয়া যেতে পারে। ধানের আর পাটের জমি কমিয়ে বাড়তি জমিতে কোথায় কোন্ ফসল হতে পারে তার একটা সম্পূর্ণ ছক করে ফেললে সে।

তারপর হিসাব হল যে, গৃহস্থেরা যদি 'কো-অপারেটিভ সোসাইটি' গঠন করে এবং তার মেম্বাররা সবাই যদি ভাল ভাল গরু কেনে, তবে সোসাইটি সেই দুধ কিনে নিয়ে ঘি, মাখন, ছানা করে কলকাতা বা অন্য দেশে পাঠালে অনেক টাকা হতে পারে।

সে এক বিস্তারিত স্কীম ত'য়ের হল। যতই সে তাই নিয়ে ভাবে ততই তার প্রাণ উৎসাহে ভরে ওঠে। একবার যদি গাঁয়ের সবাই মিলে এই প্রণালীতে কাজ করতে লেগে যায় আর দেখাদেখি আশে পাশে এ গ্রামের দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে পড়ে, সবার ঘরে সম্পদের ছড়াছড়ি লেগে যাবে।

এমন একটা স্কীম সে শুধু মাথার ভিতর আটকে রাখতে পারলে না। তার হাত পায় ভয়ানক সুড়সুড়ী লেগে গেল। সেই মোটা কাগজের বস্তা নিয়ে সে গেল ভুবনবাবুর কাছে। ভুবনবাবু দু'-চার মিনিট তার দুই-একটা কথায় আপত্তি উত্থাপন করে শেষে হাই তুলতে তুলতে সতৃষ্ণ নয়নে দাবার ছকের দিকে চাইতে লাগলেন।

যোগেশকে বোঝাতে গিয়ে রবীন মাষ্টার দেখলে আরও বিপদ। যোগেশ শুনল অল্পই। শুধু মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। তার যত সব

পারিষদ, তারা রবীন মাষ্টারের এই বস্তা নিয়ে এমন মস্করা আরম্ভ করে দিলে, যেন রবীন মাষ্টারের এত সাধের স্কীম শুধু পাগলের প্রলাপ !

বস্তা গুটিয়ে রবীন মাষ্টার গেল সতীশ চৌধুরীর কাছে। তিনি কিছুক্ষণ বেশ মনোযোগ দেখিয়ে শুনলেন। রবীন মাষ্টার উৎসাহিত হয়ে কাগজের পর কাগজ, চার্টের পর চার্ট, হিসাবের পর হিসাব খুলে দেখাল। সতীশবাবু কোনও তর্ক করলেন না এবং যদিও দেখালেন যে, কতই শুনছেন, শুনলেন না কিছুই। সমস্তক্ষণ তিনি ভাবতে লাগলেন, "লোকটা একেবারে ক্ষেপেই গেল দেখছি।"

এঁদের কারও কাছে কোনও সাড়া না পেয়ে রবীন মাষ্টার ভাবলে যে, একবার চাষীদের ভিতর গিয়ে তাদের বোঝাবার চেষ্টা করবে। গেল সে মণ্ডলদের বাড়ী বাড়ী। লম্বা লম্বা বক্তৃতা করে তাদের বোঝাতে লাগল।

তার মাসখানেক চেষ্টার ফল হল এই যে, দু'পাঁচ মাইল দূর পর্য্যন্ত সবাই বলাবলি করতে লাগল যে, রবীন মাষ্টার একদম ক্ষেপে গেছে। সে একটা বস্তা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় আর ভাবে, সেই বস্তার জোরে রাতারাতি লাখপতি হবে।

ইস্কুলের একদল ছেলে একদিন মাঠে বসে তার কথাই আলোচনা করছিল। সবাই বললে, রবীন মাষ্টার যে পাগলা হয়ে গেল, কোন্‌দিন ছেলেদের কি করে বসবে তার ঠিকানা কি ?

একটা ছেলে বললে, "কিন্তু ভাই, এত যে পাগল হয়েছে তবু পড়ায় কিন্তু চমৎকার। বই না খুলে যা ক্লাসে বলে দেয়, তা আর ভোলা যায় না।"

আর একজন বললে, "সে দিকে ঠিক আছে পাগল। ইস্কুলের কাজে একচুল এদিক ওদিক নেই। কিন্তু একবার ওর ওই স্কীমের কথা উঠলে

হয়। সে যা বকতে থাকবে তার আর থামা নেই। সেদিন সেকেণ্ড মাষ্টার, ভাই, তুলেছিলেন কথা, অমনি সে চীৎকার করতে সুরু করে দিলে ঝাড়া একঘণ্টা। মাষ্টারেরা সবাই হাসতে লাগল।”

দূরে বস্তা হাতে রবীন মাষ্টারকে দেখা গেল। তিনি আসছিলেন অছিম মোড়লের বাড়ী থেকে।

একটা ছেলে বললে, “ওই আসছে।”

আর একজন বললে, “র’স ওকে নিয়ে একটু রগড় করা যাক।”

যারা পাগল, তাদের নিয়ে ‘রগড় করা’ আমরা বুদ্ধিমান লোকেরা একটা সম্পূর্ণ-নির্দ্দোষ খেলা বলে মনে করে থাকি। পাগল যে বড় একটা আঘাত পেয়েছে অদৃষ্টের কাছে, সে যে মানুষ হয়েও মানুষ নয়, সে কথা শিশুরা জানে না, যুবকেরা ভাবে না, আর বর্ষীয়ানদের মধ্যে অন্তত বারো আনা লোক ভুলে যায়। যেখানে অদৃষ্টের নির্ম্মম আঘাতে সে বেচারা জর্জ্জরিত, সেখানে তাকে ক্ষেপিয়ে তার দুর্দ্দশা বাড়ানটা বেশীর ভাগ লোকে দোষ মনে করে না। যুবকেরা সাধারণতঃ এটাকে মনে করে একটা নিছক আমোদ।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে যখন রবীন মাষ্টার পাগল সাব্যস্ত হয়ে গেছে তখন এই ছোকরার দল ভাবলে যে তাকে নিয়ে রগড় করাটা তাদের ন্যায্য খেলা।

তাই রবীন মাষ্টার যেই কাছে এল, ছেলেরা তাকে ঘিরে ধরলে।

সবচেয়ে বাঁদর একটা ছেলে বললে, “স্যর, আমরা আপনার স্কীম শুনব।”

ছেলেদের এই কথায় রবীন মাষ্টার ভারি উৎসাহিত হয়ে বললেন, “শুনবে? ভারী খুসী হলাম শুনে। তোমরাই তো করবে এসব

দু'দিন বাদে। তোমাদের শোনা চাই, আচ্ছা বস।"—বলে বস্তাটা পাশে রেখে রবীন মাষ্টার তাদের বোঝাতে আরম্ভ করলে।

ইতিমধ্যে ছেলেরা তার পাশ থেকে বস্তাটা সরিয়ে নিয়ে অনেক দূর চালান করে দিয়েছে। রবীন মাষ্টার বললে, "কথাটা তোমরা বেশ বুঝতে পারবে একটা চার্ট দেখলে।" তখন সে সেই চার্ট বের করবার জন্য বস্তা খুঁজতে গিয়ে দেখলে নেই।

পোটলা না দেখে রবীন মাষ্টার অস্থির হয়ে গেল। তার এতদিন-কার এত পরিশ্রমের ফল ওর ভিতর। যে প্রণালীতে কাজ করে চার-পাঁচ বছরে তার গ্রামের চেহারা ফিরে যাবে—সে সবই ওর ভিতর! ওটা হারালে ওই জিনিষ ফিরে তৈরী করতে লাগবে তার আরও এক বচ্ছর!

পাগলের মত সে চারদিকে খুঁজতে লাগল। মনভোলা মানুষ সে—ঠিক করতে পারলে না, অছিম মোড়লের বাড়ী থেকে বস্তাটা নিয়ে এসেছে কি না। মনে তো হল এনেছে, কিন্তু, যাক একবার দেখেই আসা যাক। ছুটলে সে অছিমের বাড়ীর দিকে। এই ফাঁকে একটা ছেলে তার কাঁধের উপর থেকে চাদরটা সরিয়ে নিলে। ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে ছিল রবীন মাষ্টার, টের পেলে না কিছুই।

ছেলেরা মুখ চেপে চেপে হাসছে। তাদের দম ফাটে আর কি?

অছিম মোড়লের বাড়ীর দিকে খানিক দূর যাবার পর তার উপর একটা ছেলের মায়া হল। সে বললে, "ছি, বুড়ো মানুষকে নাহক দৌড় করান কেন? দিয়ে দাও ওটা!"

যার হেপাজতে সে বস্তাটা ছিল, সে বললে, "দাঁড়া না, আর একটু রগড় দেখ্।"

কিন্তু প্রথম ছেলেটা চটে গেল। ক্রমে বেশ রাগারাগি হতে

লাগল। শেষ পর্য্যন্ত সেই ছেলেটা বস্তা আর চাদর কেড়ে নিয়ে ছুটে গিয়ে বললে, "স্যর, স্যর, এই যে পাওয়া গেছে।"

হারানিধি পেয়ে রবীন মাষ্টার এতটা উল্লসিত হ'য়ে গেল যে, তা কোথায় ছিল, কেমন করে পাওয়া গেল এই সমস্ত অবান্তর বিষয়ের আলোচনাকে সে মোটে আমল দিলে না। লোভীর মত ছুটে এসে বস্তাটা নিয়ে চাদরটা কাঁধে ফেলে সে সোজা ছুটল বাড়ীর দিকে।

একটা ছেলে বললে, "স্যর স্কীমটা—"

রবীন মাষ্টার বললে, "আজ থাক বাবা, আর একদিন বোঝাব।"

অছিম মণ্ডল যদিও জানত যে, রবীন মাষ্টার পাগল হয়ে গেছে এবং তার স্কীমটা একটা পাগলামীর খেয়াল, তবু সে শুনেছিল রবীন মাষ্টারের সব কথা।

বোঝে নি সে কিছুই, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মোদ্দা কথাটা অছিম এই বুঝলে যে, সবার জমি এক লপ্ত করে তার পর ভাগ করে নিয়ে আবাদ করাতে হবে নানা রকম ফসল—এবং তাই করলেই ফসলের দাম চারগুণ হয়ে যাবে। কথাটা তার কাছে হাস্যকর মনে হল। সে বললে, "আচ্ছা বাবু, সব না হয় হল। আমরা সব জমি এক করে নিলাম—কিন্তু জমিদার যখন গলাটিপে ধরবে, বলবে তার সীমানা গোলমাল করেছি—কিম্বা চাইবে আমার জমির খাজনা আমারই কাছে—তখন? আর তা ছাড়া, আমরা খেটে খুটে জমির ফসল বাড়ালেই, জমীদার খাজনা বৃদ্ধি চাইবে—তার কি?"

রবীন মাষ্টার বললে, "সে জন্যে ভাবনা নেই। আমি সেসব ঠিক করে দেব। ভুবনবাবুকে বললেই তিনি ঠিক করবেন সব। তা ছাড়া, আমি যা বলছি এ তো শুধু প্রথম কাজটা। এর পর তোমরা

জমিদারের স্বত্বও তো কিনে নেবে। তোমরাই হবে মালিক।"—বলে সে তার স্কীমের এই অংশটা বোঝাতে লাগল!

অছিম মোড়ল হেসে বললে, "তা বেশ, জমিদারকে আপনি ঠিক করুন আগে, তারপর আমরা শুনব আপনার কথা।"

রবীন মাষ্টার একথায় উৎসাহিত হয়ে উঠল। এ পর্য্যন্ত তার সঙ্গে এতখানি আলোচনা কেউ করে নি, কেউ এইটুকু উৎসাহও তাকে দেয় নি। তাই রবীন মাষ্টার অছিম মণ্ডলের কথাগুলো মনে মনে নাড়া চাড়া করতে করতে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠছিল। আর সে স্থির হয়ে থাকতে পারলে না। অমনি আবার তল্পী বগলে করে সে ছুটলো ভুবনবাবুর কাছে। গিয়ে সে বললে, "এইবার সব ঠিক হয়ে গেছে।"

ভুবনবাবু আবাক্ হয়ে বললেন, "কি ঠিক হয়ে গেছে?"

"অছিম মণ্ডল বলেছে সে প্রজাদের সব ঠিক করে দেবে। আপনি রাজী হলেই হয়। আর এতে আপনার গররাজী হবার কোনও কারণ নেই, কারণ আপনার লাভ যথেষ্ট।"

এই স্কীম সম্বন্ধে রবীন মাষ্টার এত লোকের সঙ্গে এত আলোচনা করেছে যে, সে সহজেই ধরে নেয় স্কীমের সবগুলি অন্ধি সন্ধি তার শ্রোতার শুধু জানা নয়, মুখস্ত আছে। কিন্তু সবাই তার কাছে সে স্কীমের কথা শোনেও নি, আর যে শুনেছে সেও তার কথাগুলো সর্ব্বদা মাথায় বয়ে বেড়ায় না। তাই অনেক সময়ই তার কথাগুলো হয় ওঠে সম্পূর্ণ অবোধ্য।

ভুবনবাবু বুঝলেন না কিছুই, বললেন, "রাজী হব, কিসে?"

বেশ প্রশান্তভাবে রবীন বললে, "আপনার মালিকী স্বত্বটা ছেড়ে দিতে। ওটা রেখে তো আর দরকার নেই আপনার। —যে কালে—"

আর বলা হল না। ভুবনবাবু আবাক্ হয়ে বললেন, "বটে, তুমি এই কথা নিয়ে প্রজাদের সঙ্গে ঘোঁট পাকাচ্ছ। তা হলে তোমার এসব পাগলামী নয়, পেটে পেটে শয়তানি! খবরদার বলছি, ফের যদি তুমি একথা নিয়ে কথা কও তবে তোমারই একদিন কি আমারই একদিন।"

রবীন মাষ্টার একটু ভয় খেল কিন্তু তবু সে বললে, "আপনি বুঝতে পারছেন না, আমি তো অনিষ্ট ক'রছি না আপনার কিছু; মালিকীটাকে শুধু ছেড়ে দেবেন। মালিকানা পাবেন, আবার তার উপর ডিভিডেণ্ড পাবেন। বুঝতে পারছেন না? এই দেখুন, এই হিসেবটা দেখলেই—"

"আর হিসেব দেখাতে হবে না বাপু। তোমার কাছে বুদ্ধি ধার করে জমিদারী করতে হবে, এমন দুর্দ্দশা হয় নি আমার। বলে রাখছি মাষ্টার, সাবধান! ফের যদি তুমি তোমার ঐ বস্তা নিয়ে টুঁ শব্দটি করবে কিংবা আমার প্রজার বাড়ী যাবে, তোমার ঠ্যাং ভেঙ্গে দেব বলছি। আর ঐ যে চাকরী—এতদিন আমি ঠেকিয়ে 'রেখেছি, সেটিও থাকবে না। ওসব শয়তানি আমার কাছে চলবে না।" বেশ চটে কথা ক'টা বল্লেন তিনি।

এইবার রবীন মাষ্টার রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। সে ভাবলে, গেল বুঝি চাকরিটুকু। চক্ষে সে সরষে ফুল দেখতে লাগল। ভুবন-বাবুর পায়ে ধরে মাপ চাইলে। বললে, আর কখনও সে ওকাৰ্য্য করবে না।

ভুবনববাবু বললেন, "তবে তোমার ঐ বস্তাটা দাও আমি ওটাকে রেখে দিচ্ছি।"

বুকটা যেন ফেটে গেল রবীন মাষ্টারের! তার এতদিনকার পরিশ্রমের

ফল এমনি করে সঁপে দিতে তার কিছুতেই মন সরতে চাইল না। কিন্তু সে নিরুপায়। দিলে সে বস্তাটা। ভুবনবাবু একটা খানসামাকে ডেকে সেটাকে সিন্দুকে বন্ধ করে রাখতে বললেন।

৬

এরপর লোকে দেখলে রবীন মাষ্টারের ক্ষেপামি যেন একদম সেরে গেল। কাগজের বস্তা নিয়ে বাইরে বাইরে সে আর ঘোরে না। কেউ জিজ্ঞেস করলেও সে তার স্কীমের কথা কিছু বলে না। সে আবার ঢুকল গিয়ে তার সেই বইয়ের দুর্গে।

কিন্তু কিছুদিন পরে একদিন হঠাৎ দেখা গেল লাঙল কাঁধে ফেলে গরু ঠেলতে ঠেলতে তার দুই ছেলেকে নিয়ে সে চলেছে জমির দিকে। অবাক্ হয়ে সবাই দেখতে লাগল। ঘরে ঘরে রটে গেল, রবীন মাষ্টার আবার ক্ষেপে গেছে!

ব্যাপারটার ইতিহাস এই—

তার স্কীম যদিও ভুবনবাবুর সিন্দুকে বন্ধ রইল, তবু তার জন্য খেটে খেটে কৃষি সংগঠন ও কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে সে যে-সব তত্ত্ব সংগ্রহ করেছিল, সেগুলো তার মাথার ভিতর কেবলই ঘুরতে লাগল।

ভেবে ভেবে সে স্থির করলে যে চাষের সুব্যবস্থার দ্বারা জমি থেকে সম্পদ যে আদায় করা যেতে পারে, সেটা হাতেকলমে না দেখাতে পারলে লোকের চোখ ফুটবে না। সমস্ত গ্রামের জমি তার হাতে না এলে, তা ঠিক দেখাবার উপায়ও নেই ; কিন্তু তার নিজের যে বিঘে-ছয়েক জমি, আর বাড়ীর যে দু'বিঘে জমি আছে, সেটাতে একটুকু বুদ্ধি খরচ করে সে তবু লোককে কতকটা বোঝাতে পারবে।

তখন রবীন মাষ্টার ঠিক করলে, এবার সে বর্গা বিলি করবেই না। গোপনে গোপনে সে হাল-গরু কিনে ফেললে। একটা পাঞ্জাবী হাল আনালে ঢাকা ফার্ম্ম থেকে। সেখান থেকে নানা রকমের বীজও আমদানী হল। তার মনে হল, সে কেন বর্গাদারকে খাটিয়ে তার জন্মান ফসল নিতে যায়? যতটুকু জমি তার আছে, তা সে আর তার দুই ছেলে অনায়াসে চাষ করতে পারে। তা না করে সে কেন মিছে মালদার হয়ে বর্গাদারকে শোষণ করতে যাবে?

তার বড় ছেলে ম্যাট্রিক ফেল করেছে। পরের ছেলেটা লেখা পড়ায় ভাল। কিন্তু রবীন মাষ্টার ভেবে দেখলে তাতে লাভ কি? লেখা পড়া শিখে করবে তো কেরাণী-গিরি, না হয় কোনও রকম শোষণ বৃত্তি। তার চেয়ে নিজে হাতে চাষ-বাস যদি করতে পারে, তবে ঘরে বসে লেখা পড়া শিখে পণ্ডিত হতে তাদের ঠেকাবে কে?

ছেলে দু'টোকে ডেকে রবীন মাষ্টার তাদের বোঝালে অনেকক্ষণ। ছেলেরা বাপের খুব বাধ্য। বাপ যা বললেন, তাতেই তারা রাজী হল।

চৈত্রমাসে খুব এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। চাষীরা সব বেরিয়ে পড়লো ক্ষেতে হাল দিতে। ইস্কুল সেদিন ছুটি। রবীন মাষ্টারও হাল-গরু ঠিক করে দুই ছেলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

নিস্তারিণীর কাছে কথাটা একেবারে গোপন রাখা হয়েছিল। হাল-গরু ছিল অন্য একটা গেরস্ত বাড়ীতে। তাই যখন পিতা ও পুত্রদ্বয় বেরিয়ে গেল, নিস্তারিণী তখন খবর পেলে না।

ঘণ্টাখানেক পর পাড়া-পড়শীরা এসে খবর দিয়ে গেল। নিস্তারিণী কপালে হাত ঠুকে আর্ত্তনাদ করে উঠল—"হায় রে কপাল—এত দুঃখও লিখেছিলেন ভগবান আমার অদৃষ্টে!"

রবীন মাষ্টার তখন মনের আনন্দে লাঙ্গল ধরে গরু ঠেঙাচ্ছে। তার আশে-পাশে অন্য সব ক্ষেতে চাষারা যার যার জমি চষছে।

চিরকাল পাড়াগাঁয় মানুষ রবীন মাষ্টার। হাল বাওয়া অভ্যাস না থাকলেও সে এ বিষয়ে একেবারে আনাড়ী নয়। কাজেই জমিটা চষা হচ্ছিল ভালই। কিন্তু রবীন চেয়ে দেখলে যে, তার বাঁয়ের জমিতে নকুড় কৈবর্ত্ত, আর ডাইনের জমিতে কাঞ্চিসেখ যত তাড়াতাড়ি হাল চালাচ্ছে, সে এবং তার ছেলে তা পারছে না।

রবীন মাষ্টার হাঁপিয়ে পড়ল। ছোট ছেলে এসে তার হাল ধরলে সে গাছতলায় গিয়ে বিশ্রাম করতে লাগল। কাঞ্চি কিন্তু সমানে হাল চালিয়েই যাচ্ছে। আর নকুড় হাল চালাতে চালাতে গলা ছেড়ে একটা গান ধরলে।

গামছা দিয়ে হাওয়া খেতে খেতে রবীন মাষ্টার একবার কাঞ্চির আর একবার নকুড়ের জমির কাছে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে মাটি দেখলে; চষা মাটির ভিতর লাঠি চালিয়ে দিলে। সে দেখতে পেলে যে, কাঞ্চি শেখ শুধু তাড়াতাড়ি হাল বাইছে না; তার হালে মাটিও কাটছে গভীর করে। তারপর নিজের জমির মাটি পরীক্ষা করে সে দেখতে পেলে যে, তার পাঞ্জাবী হালে মাটি সবচেয়ে গভীর করে কেটে গেছে।

নিজের কাজ দ্রুত এগুচ্ছে না দেখে সে একটু দমে গিয়েছিল কিন্তু চাষটা যে ওদের চেয়ে ভাল হচ্ছে তা দেখে তার ভারী উৎসাহ হল।

এমন সময় নিস্তারিণী এসে আর্ত্তনাদ করে পড়ল! তাকে সেখানে ঐ অবস্থায় দেখে রবীন মাষ্টারের পেটের পিলে চমকে গেল। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

এ অবস্থায় কি যে কর্ত্তব্য তা ঠিক করতে পারলে না রবীন মাষ্টার।

তার ক্ষেতের চারধারে লোক দাঁড়িয়ে গেছে। এতগুলো লোকের চোখের সামনে নিস্তারিণী এখুনি না জানি কি একটা কেলেঙ্কারী করে বসবে, এই ভেবে রবীনের বুক একেবারে দমে গেল! আকাশটা হয় তো এই মুহূর্ত্তে ভেঙ্গে পড়বে কিম্বা পৃথিবীটা উল্টে জলস্থল একাকার হয়ে যাবে। এমনি একটা অস্পষ্ট আশঙ্কায় তার মন চঞ্চল হয়ে উঠল।

কিন্তু রবীন মাষ্টার দেখে অবাক্ হয়ে গেল যে, তেমন কিছুই হল না।

বড় ছেলে রণেন তখন বসে বিশ্রাম করছিল। মাকে সেই অবস্থায় আছড়ে পড়তে দেখেই সে গিয়ে বললে, "এ কি কাণ্ড করছ তুমি মা? লজ্জা সরমের মাথা খেয়েছ?"

তা দেখে রবীন আরও ভয় পেয়ে গেল। নিস্তারিণীকে এমনি করে বকলে তখনি যে একটা ভিসুয্ভিয়াসের অগ্ন্যুদগার হতে পারে সেই কথা ভাবতেই হাতে-পায়ে খিল ধরে গেল মাষ্টারের।

কিন্তু ফল হল উল্টো। স্বামীর কাছে যার অখণ্ড প্রতাপ, দেখা গেল সেই নিস্তারিণী ছেলের বকুনিতে একেবারে থতমত খেয়ে গেল। রণু তাকে টেনে নিয়ে গেল বাড়ীর দিকে।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল মাষ্টারের। নিস্তারিণী বাড়ীর দিকে পা বাড়াতেই সে হালের বাঁটটা ধরে মুখে বিচিত্র শব্দ করতে করতে গরুকে তাড়না করতে লাগ্‌ল।

দু'বিঘা জমি চষে রবীন মাষ্টার সে দিন বুক ফুলিয়ে বাড়ী ফিরল। গ্রামের লোকের সে দিন এই দুঃখে আর ঘুম হল না যে, রবীন মাষ্টার আবার ক্ষেপে গেছে।

রবীন মাষ্টার পয়সা খরচ করে জমিতে সার ফেলছিল, ভাল ভাল বীজ এনে আবাদ করেছিল, আর কৃষি-বিভাগের বই এনে তার সব

উপদেশ পালন করেছিল। কাজেই তার ক্ষেতে যা চারা জন্মাল, সে চমৎকার। সেগুলো বাড়তেও লাগল বেশ। নিজেদের ক্ষেতের চারার পাশে রবীনের ক্ষেতের চারা দেখে চাষীদেরও চমক লেগে গেল। তারা রবীন মাষ্টারকে এসে জিজ্ঞেসাবাদ করতে লাগল, কি সে করেছে, কোথা থেকে বীজ এনেছে, ইত্যাদি। রবীন মাষ্টারের মহা আনন্দ। আবার তার মুখ খুলে গেল। যার সঙ্গে দেখা হয়, তাকেই ধরে ভিন্ন ভিন্ন ফসলের জন্য কেমন করে জমি তৈরী করতে হয়, কি সার দিলে কেমন ফসল ফলে ইত্যাদি কৃষিতত্ত্ব ঘটিত বিস্তারিত না শুনিয়ে ছাড়ত না।

সে-বছর বর্ষাটাও হল বেশ। ক্ষেতের চারাগুলো প্রাণভরে জল পেয়ে জীবনরসে ভরপূর হয়ে তাজা সবুজ শোভা ছড়িয়ে বাড়তে লাগল। চাষীর প্রাণ ক্ষেতের দিকে চেয়ে আনন্দে নেচে উঠল। রবীন মাষ্টার আর তার ছেলে রণুর আহ্লাদের সীমা রইল না।

কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই ধাঁ ধাঁ করে বাড়তে লাগল জল। খাল বিল যেখানে যা ছিল, বুক ভরে ফেঁপে উঠল। ক্ষেত-খোলা সব গেল ভেসে। চারাগুলো গেল ডুবে। এত তাড়াতাড়ি বাড়ল জল যে, আমন ধান পর্য্যন্ত তার সঙ্গে তাল সামলে বাড়তে পারল না।

রবীন মাষ্টার মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। চাষের জন্য খরচ করেছিল সে সবার চেয়ে বেশী।

জল নেমে গেলে দেখা গেল ধানের বারো আনা নষ্ট হয়ে গেছে। পাট বারো আনা রকম বজায় আছে বটে তবে এমন খারাপ হয়ে গেছে যে তার দাম হবে না। সবই মাটি হয়ে গেল। কেবল খুব উঁচু জমিতে বোনা আখগুলোর অনিষ্ট হয়নি। রবীন মাষ্টারের ধান কিন্তু নষ্ট হয়েছিল অন্যের

চেয়ে কম। বর্ষাটা এসে পড়বার আগেই তার চারাগুলো অন্তের চারার চেয়ে প্রায় আধ হাত বড় হয়েছিল। তাই একেবারে জলে ডুবে যায় নি।

তা হলে কি হয়, একদিন রাত্রে দেখা গেল চারটে গরুতে মিলে ধান-ক্ষেতে চরছে মনের আনন্দে। আর একদিন কোথা থেকে একপাল বুনো শূয়োর এসে তার আখের ক্ষেত তচ্ নচ্ করে দিলে।

৭

রবীন মাষ্টার মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে লাগল, তার অদৃষ্টের কথা। এ শুধু তার দুর্ভাগ্যের ফের। নইলে এবার সে ক্ষেত থেকে যা ফসল ঘরে আনতে পারত জন্মে সে কখনও তা পায় নি।

সে দিন ক্ষেতের ধান মাড়াই হয়ে জমা হলে দেখা গেল, গত বছর বর্গাদার যা দিয়েছিল, এ তার চেয়েও কম। অন্য ফসল যা হয়েছিল সব নষ্ট হয়ে গেছে। শূয়োরের খাবার পর আখের যা অবশিষ্ট ছিল, ছেলেপিলেরা চিবিয়েই তা মেরে দিয়েছে।

তার সমস্ত জীবনের পুঞ্জীভূত নিস্ফলতার ভারে যখন চুরমার হয়ে যাচ্ছে তার হৃদয়, তখন নিস্তারিণী মুখটা বেঁকিয়ে বললে, "আহা! বাপ বেটায় চাষ করে ধান এনেছেন দেখ! মরে যাই আর কি!"

উঠোন ঝাট দিয়ে মাতঙ্গী ধানগুলো জড়ো করে ধামায় ধামায় ভরে ঘরে নিচ্ছিল। নিস্তারিণী তার কাছে ছেলে কোলে করে তদ্বির করছিল। কোথায় কোন্ কোণায় দু'চার দানা ধান হয় তো পড়েছিল, মাতঙ্গীর চোখে পড়ে নি তখনও, সেই ক'টা কুড়িয়ে এনে ধামায় ফেলে সে মাতঙ্গীকে শাসাচ্ছিল, "ভাল করে কুড়িয়ে নে ঠাকুরঝি—ধান লক্ষ্মী!

একদানা যদি নষ্ট হয় তো লক্ষ্মী রাগ করবেন! এমনি তো ঘরে বসে আছেন জ্যান্ত অলক্ষ্মী!"—বলে স্বামীর দিকে চাইলে।

নিস্তারিণীর কথাগুলো আজ যেন রবীন মাষ্টারের বুকে বিষের ছুরির মত বিঁধছিল। অনেক সয়েছে সে, কিন্তু আজ যেন আর সইতে পারে না। ক্রোধ—যা জীবনে কোনও দিন সে দেখায় নি, ভাল করে অন্তরেও অনুভব করে নি, সেই ক্রোধ যেন গোখ্‌রো সাপের মত মনের মাঝে গর্জ্জন করে উঠল।

রণু বাড়ী নেই। নইলে সে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করত। মায়ের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে পারত যে, তাদের ঘরে আজ যে ধান উঠেছে অন্য চাষীর ঘরে তার অর্দ্ধেকও ওঠে নি।

নিস্তারিণী বলল, "ঐ যে বলে,—'যার কর্ম্ম তারে সাজে' ভদ্রলোকের ছেলে তাদের না কি সাজে চাষ করা! আমি আগেই জানি এই হবে।" রবীন মাষ্টার জীবনে এই প্রথম চোখ রাঙিয়ে নিস্তারিণীকে বললে, "তুমি জান তোমার গুষ্টির মাথা। লক্ষ্মীছাড়ী!" বলে দাঁত কড়্‌-মড়্‌ করতে করতে ঢুকল গিয়ে তার বাইরের ঘরে।

নিস্তারিণী স্বামীর এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে এতই আশ্চর্য্য হয়ে গেল যে, কিছুক্ষণ সে কোনও কথাই বলতে পারলে না। রাগে কট্‌ মট্‌ করে কাঁপতে কাঁপতে চেয়ে রইল শুধু। তার পর আরম্ভ হল তর্জ্জন, গর্জ্জন, বর্ষণ এবং শেষে বন্যা।

রবীন মাষ্টার তখন বাইরের ঘরে। হাতের সামনে যে বইটা সে পেলে সেইটা নিয়ে তার উপর চোখ বুলোতে লাগল।

মানুষ আঘাত খেয়ে খেয়ে যখন ব্যথায় জর্জ্জরিত হয় তখন তার মন অতীত মুখী হয়ে ওঠে। সে তার অতীতের দিকে ফিরে তাকাতে চায়।

পুরোণো সুখ-দুঃখের স্মৃতির মধ্যে আত্মমগ্ন হয়ে নিজের ব্যর্থতা ভোলবার চেষ্টা করে।

বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে নিজের অজ্ঞাতেই এক সময় রবীনের মনের পর্দ্দায় জীবনের পুরনো ছবি গুলো ভেসে উঠতে লাগল একে একে। সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার পর থেকে তার জীবনে স্নেহ প্রীতি শ্রদ্ধা ভালবাসার একান্ত অভাব। অথচ চিরকাল এমন ছিল না। অনেকদিন বাদে তার এক পুরনো ছাত্রীর কথা মনে পড়ল।

রবীন ঢাকায় এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে থেকে বি-এ পড়ত। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সে তাঁর মেয়ে তড়িতের শিক্ষার ভার নিয়েছিল। তিন বছর সে পড়েছিল রবীনের কাছে। তারপর যেবার সে ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠল, সেবার রবীন ফিরে এল দেশে।

তড়িৎ দেখতে সুন্দর নয়। কিন্তু তার স্বভাবটি ভারী মিষ্টি। রবীনকে সে খুব শ্রদ্ধা ভক্তি করত, ভালবাসত।

তড়িতের স্মৃতি রবীন মাষ্টারের ব্যথিত মনের উপর একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দের প্রলেপ বুলিয়ে দিল। কতই বা বয়স তখন তড়িতের। তার আদর্শ, তার বক্তব্য বোঝবার জন্য সেই কৈশোরেই তড়িতের কত না আগ্রহ, কত না উৎসাহ ছিল। তাকে সে অন্তরের সমস্ত সহানুভূতি দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেছে। এমন একজন দরদী বন্ধু রবীন মাষ্টারের জীবনে আর কখনও আসেনি। মায়ের স্নেহ, ভগ্নির প্রীতি, বন্ধুর সাহচর্য্য এবং শিষ্যার ভক্তি মূর্ত্ত হয়ে উঠত সেই ছোট মেয়েটির মধ্যে। সে ছিল এক অনাবিল স্বর্গীয় ভালবাসা।

তড়িতকে একবার চোখের দেখা দেখবার জন্য হৃদয় তার ব্যাকুল হয়ে উঠল। কোথায় আছে সে, কেমন তার স্বামী আর ছেলে পুলেই বা কটা

এই সব প্রশ্ন আলোড়িত করতে লাগল রবীনের মনটাকে। হঠাৎ তার মনে পড়ল ঢাকা থেকে চলে আসার পর তড়িৎ তাকে অনেক চিঠি লিখেছে। সেই চিঠি গুলো এখনও আছে তার তোরঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে সে তোরঙ্গ খুলে বার করল একটা পোটলা। একে একে তার শত আবরণ উন্মোচন করে ক্রমে তার ভিতর থেকে বার হল তড়িতের একতাড়া চিঠি। তুচ্ছ ও মহান বহু বিবরণে ভরা। তার আদরের বেড়ালের কটি ছানা হয়েছে, তার কোন্‌টি কেমন—এমনি সব ছোট কথা থেকে জীবনের বড় বড় সমস্যার অনেক আলোচনা আছে তার মধ্যে।

সেই চিঠির ভিতর ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ হয়েছে তড়িতের সাত বছরের জীবনের সমস্ত ইতিহাস। তার অন্তরের ক্রমবিকাশের ইতিবৃত্ত।

বি-এ পাশ করার পর সে লিখেছিল :—'আমি বি-এ পাশ করেছি। আপনি আমায় যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সে শিক্ষা না পেলে আমার বি-এ পাশ করার শক্তি হতনা। তাই এখবরটা আপনাকে আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি। আশা করি, আপনিও আনন্দ লাভ করবেন।'

রবীন আনন্দলাভ করছিল বৈকি। শিষ্যার সাফল্য যে তার গুরুরই সাফল্য।

## ৮

কেটে গেল আর একটা বছর। বলা বাহুল্য, রবীন মাষ্টার নিজ হাতে চাষ-আবাদের চেষ্টা ছেড়ে দিলে, ঠিক যেমন সে আর সব চেষ্টাই ছেড়েছিল ঘা খেয়ে। রণু এতে আপত্তি করেছিল। তার সঙ্গে রফা হল এই যে, সে ঢাকায় গিয়ে ফার্ম্মে কৃষি-বিদ্যা শিখে এসে হাতে-কলমে চাষ করবে।

হেড মাষ্টারের কাছে তাড়ার পর তাড়া খেয়ে রবীন মাষ্টার স্কুলের কোনও কথার সাতে-পাঁচে থাকত না। সময় মত স্কুলে গিয়ে রুটীন বেঁধে পাঁচ ঘণ্টা পড়িয়ে সে বাড়ী ফিরে আসত। স্কুলে কোথায় কি হচ্ছে, কে কি বলছে, তার কোনও খবরই রাখত না।

একদিন বাড়ী ফেরার সময় ষষ্ঠ শ্রেণীর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে দেখতে পেলে যে মাষ্টার মশায় টেবিলের উপর কয়েকটা মেটে গেলাস আর গোটাকয়েক গাছপালা নিয়ে বই থেকে পড়ছেন আর সেই সব জিনিষ নেড়েচেড়ে মাঝে মাঝে ছেলেদের দেখাচ্ছেন। কৌতূহলী হয়ে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ সে শুনলে মাষ্টারের পড়ানো। খুব ছোট ছোট ছেলেদের ক্লাসে উঁকি মেরে সে দেখতে পেলে যে, ছেলেরা লাল-সবুজ কাগজ কেটে সেগুলো ভাঁজ করছে।

স্কুলের ছুটির পর রবীন মাষ্টার সেই দুই ক্লাসের মাষ্টারকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে, তারা কি করছিল। একজন বললে, প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ, আর একজন বললে-কাগজ ভাঁজাই।

রবীন বললে, "তোমরা যে এই সব কর, হেডমাষ্টার জানেন ?"

"কেন জানবেন না ? তিনিই তো বলে দিয়েছেন।"

অবাক হয়ে রবীন মাষ্টার বললে, "তিনি বলে দিয়েছেন ? বল কি ? তিনি যে এ সবের ওপর ভারি চটা !"

এক মাষ্টার বললে, "কই না। তিনিই তো আমাকে **Teachers Manual** দিয়ে এ সব পড়াতে বলে দিয়েছেন।"

রবীন বললে, "বটে, বটে, ভারি আশ্চর্য্য তো !"

আর এক মাষ্টার বললে. "আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। হেডমাষ্টার কি আর অমনি করছেন এ সব ? ইনস্পেক্টরের সার্কুলার এসেছে, **Nature study, Manual training**—এ সব শেখাতে হবে।"

রবীন বললে, "তাই না কি? বেশ তো। কিন্তু তুমি ওই যা করছিলে ওকে কিন্তু Nature study বলে না। সে কেমন করে করতে হয় তার বই আছে আমার কাছে। দেখতে চাও তো যেও আমার বাড়ী। আর তুমিও গিয়ে দেখে এসো না কাগজ কাটা, কাগজ ভাঁজ করবার কত প্যাটার্ণ আছে।"

মাষ্টার দু'টি তার বাড়ীতে এলে রবীন মাষ্টার তাদের বই খুলে অনেকক্ষণ অনেক কথা বোঝালে, অনেক ছবি দেখালে, শিক্ষার থিওরী নিয়ে অনেক বক্তৃতা করলে। তারা দু'খানা বই বগলে করে যখন বেরিয়ে গেল, রবীন মাষ্টার তখন তার ঘরে বসে কেবলি হাসতে লাগল।

তার মনে হল ঠিক পনের বছর আগে সে ছেলেদের নিয়ে প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করাত, হাতের কাজ শেখাত। তখন হেডমাষ্টার এসে তার উপর কি রাগ! ফলে সেটা বন্ধ করতে হয়েছিল। বিশ বছর আগে সে যা করত আর পনের বছর আগে জোর করে যা বন্ধ করা হয়েছিল, আজ হেডমাষ্টারবাবু একেবারে নতুন আমদানী বলে সে জিনিষ চালাতে আরম্ভ করছেন! কি বেকুব দুনিয়ার লোক, কি অজ্ঞ! ভাবতে তার হাসি পেল।

হেডমাষ্টার তো জানতেন যে, এ সব বিষয় রবীন মাষ্টার বেশ ভাল করেই জানে। কিন্তু জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত না করে ভার দিলেন দুই ছোকরাকে, যারা এ সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ। রবীন মাষ্টার হাসতে হাসতে ভাবলে, কোন্ মুখে আর ডাকবে সে আমায়? তা হলে যে নাক কাটা যায়।

কথাটা তার অন্তরকে আর পীড়া দিল না। মনে হল মহা হাস্যকর একটা ব্যাপার। তাই সে বসে বসে হাসতে লাগল।

নিস্তারিণী তখন সেই ঘরে এসে স্বামীকে অমনি একলা বসে হাসতে দেখে মহা ভয় পেয়ে গেল। স্বামী পাগল হয়ে গেছেন ভেবে সে বাড়ীর ভিতর ছুটে গিয়ে লোক ডাকা-ডাকি সুরু করলে।

অনেকে এল। সব শেষে এলেন কবরেজ মশায়।

তিনি বললেন, "খবর পেলাম আপনার না কি অসুখ!"

"আমার অসুখ! পাগল হয়েছেন কবরেজ মশায়? আমার অসুখ দেখেছেন কোনও দিন?"

"আচ্ছা, তবু একবার নাড়ীটা দেখি।"

হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে দিয়ে রবীন মাষ্টার বললে, "দেখুন, মন খুসী করে দেখুন।"

কবরেজ মশায় অনেকক্ষণ নাড়ী টিপে বললেন, "হুঁ।"

রবীন মাষ্টার বললে, "হুঁ কি মশায়?"

"না বিশেষ কিছু নয়, যা ভেবেছিলাম তাই। বায়ু কুপিত। সেরে যাবে। এর জন্য চিন্তা করবেন না।"

"চিন্তা তো আমার নয় মশায়, চিন্তা দেখছি আপনারই।" বলে সে হাস্‌তে হাস্‌তে চলল ভুবনবাবুর কাছে।

রবীন মাষ্টার চলে গেলে কবরেজ মশায় নিস্তারিণীর কাছে রোগের অবস্থা শুনলেন। ঘাড় নেড়ে বললেন, উম্মাদেরই লক্ষণ বটে, তবে ভাবনা করবেন না বউ-মা, এক সপ্তাহ ওষুধ খেলেই বোধ হয় সেরে যাবে। একটু সাবধানে থাকবেন, আর ওঁকে একটু তোয়াজে রাখবেন, রাগাবেন না। একে বায়ু কুপিত তার উপর ক্রোধ হলে ঘোর অনিষ্ট হতে পারে।"

দাবা খেলে আজ রবীন মাষ্টার ভুবনবাবুকে তিনবার মাৎ করে

মহা উল্লাসে বাড়ী ফিরে এল। এসে দেখে, নিস্তারিণী তার অপেক্ষায় বাইরে এসে বসে আছে।

রবীন মাষ্টারের প্রাণ কেঁপে উঠল। দাবা খেলে ফিরতে রাত হয় বলে নিস্তারিণী রোজ সবাইকে খাইয়ে-দাইয়ে তার ভাত ঘরে চাপা দিয়ে শুয়ে থাকে। রবীন মাষ্টার এলে কোনও দিন ওঠে, কোনও দিন ওঠে না। আজ নিস্তারিণী না শুয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছে দেখে রবীনের বুকের রক্ত শুকিয়ে গেল। সে ভাবলে, আজ বুঝি কুরুক্ষেত্র !

নিস্তারিণী তাকে দেখে হেসে বললে, "যা হক, এতক্ষণে আসবার সময় হল বাবুর। আমি দু'ঘণ্টা এখানে বসে আছি।"

রবীন মাষ্টার অবাক হ'য়ে বললে, "কেন ? শোও নি তুমি আজ ?"

"কেন ? শোব কেন ? রোজই আমি শুয়ে থাকি না কি ? সারা-দিনের খাটুনীর পর একটু গা গড়াই বই তো' নয় !"

"না, না, তা করবে বই কি ? বেশ তো বেশ তো।"

বলতে বলতে সে নিস্তারিণীর সঙ্গে অন্তঃপুরে তার শোবার ঘরে গেল।

হেসে নিস্তারিণী বললে, "মুখ হাত ধুয়ে নাও।"

রবীনের ভারী আশ্চর্য্য লাগল নিস্তারিণীর এই হাসি আর এই সদয় ব্যবহার। এটা এতই অদ্ভুত যে, সে কিছুক্ষণ মূঢ়ের মত শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিস্তারিণীর দিকে। সেই দৃষ্টি দেখে নিস্তারিণীর বুক কেঁপে উঠল। মনে হল এ যেন আসন্ন উন্মাদের লক্ষণ।

মুখ হাত ধুয়ে এলে নিস্তারিণী হেঁসেল থেকে বেড়ে নিয়ে এল গরম ভাত।

রবীন মাষ্টার আজ দশ-বিশ বছর রাত্রে গরম ভাত খেয়েছে বলে

মনে পড়ল না। ভাতে হাত দিয়েই সে হাঁ করে নিস্তারিণীর দিকে চেয়ে রইল অবাক হয়ে।

স্বামীর এই দৃষ্টি নিস্তারিণীকে আরও ভয় খাইয়ে দিলে। সে বললে, "কি দেখছ? খাও।"

রবীন মাষ্টার বললে, "ভাত যে গরম।"

"গরম তাই কি? নেড়ে-চেড়ে ঠাণ্ডা করে দেব?"

"না, না। বলছিলাম, ভাত গরম হল কেমন করে?"

নিস্তারিণী ভাবলে, এ পাগলের কথা, নইলে রবীন কি জানে না, ভাত গরম হয় কেমন করে! বললে "আর রঙ্গ করতে হবে না, খাও!"

খেলে রবীন মাষ্টার পরম তৃপ্তির সঙ্গে। তারপর নিস্তারিণী নিজ হাতে পান সেজে দিয়ে তাকে পাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগল।

রবীন মাষ্টার কেবলি ভাবতে লাগল, এ হ'ল কি!

ঘরে শান্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তার পড়ার উৎসাহ বেড়ে গেল, কাজেও উৎসাহ এল।

সে ভাবলে যে, এতদিন পর হেডমাষ্টার জানতে পেরেছেন যে, রবীন মাষ্টার **Nature study** সম্বন্ধে যা বলেছিল সে কথাটা ঠিক, আর তাঁর কথাটা ভুল। যদিও রবীন মাষ্টারের কাছে সে-কথাটা স্বীকার করেন নি তিনি, তবু রবীনের মনে হল যে, এখন হেডমাষ্টার রবীনকে নিশ্চয় একটু শ্রদ্ধার চক্ষে দেখবেন। তাই সে আবার সাহস করে নিজের মতামত প্রকাশ করতে লাগল। এতদূর তার সাহস বেড়ে গেল যে, ক্লাসে ম্যাপ নিয়ে তার নিজের মনের মতন করে সে হিষ্টরী পড়াতে আরম্ভ করলে।

এমন কি একদিন সে ইতিহাসের বিবর্ত্তনের উপরও বক্তৃতা দিয়ে ফেললে। তার বক্তব্য শেষ করে সে বললে, "যুগে যুগে ক্ষুধার

তাড়নায় মানুষ দল বেঁধে পরস্পর আড়া-আড়ি করতে করতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। মানব সমাজের এই ক্রম-পরিণতির স্বরূপটাকে ফুটিয়ে তোলাই হল ইতিহাসের সার্থকতা। এতেই ইতিহাস হয় একটা বিজ্ঞান বা দর্শন।”

পেছনে পদশব্দ শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখে, ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে একজন ইংরেজ।

সাহেব এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিলেন। কাঁপতে কাঁপতে হাত বাড়িয়ে রবীন তার সঙ্গে করমর্দ্দন করলে।

সাহেব বললেন, “Good morning. আমি মিষ্টার ব্ল্যাক—স্কুলের ইনস্পেক্টর।”

স্কুল-ইনস্পেক্টর! রবীন মাষ্টার ভয়ানক ঘামতে সুরু করলে। হায় রে অদৃষ্ট! অনেক দিন বাদে আজ সে প্রথম প্রাণ খুলে স্কুলের পাঠ্যের বাইরে গিয়ে ইতিহাসের বিবর্ত্তনের তত্ত্ব বোঝাতে গিয়েছিল, আর আজই কি না ঠিক সেই সময় এসে পড়ল ইনস্পেক্টর! বরাতে দুঃখ থাকলে এমনিই হয়।

ব্ল্যাক সাহেব বছর পাঁচেক হল বিলেত থেকে এসে, এখানে কয়েকদিন কলেজে প্রফেসরী করে অস্থায়ী ভাবে সম্প্রতি এ-দিককার ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হয়েছেন। ইতিমধ্যেই রটে গেছে,—তিনি একটা ভয়াবহ জন্তু বিশেষ। অন্য ইনস্পেক্টরের মত ইনি কোনও স্কুল দেখতে আসবার আগে নোটিশ দিয়ে আসেন না। তিনি পৌছবার বড়-জোর আধঘণ্টা আগে হেডমাষ্টার খবর পান।

মাত্র পোনের মিনিট আগে হেডমাষ্টার খবর পেয়ে সাহেবের সন্ধানে লোক পাঠিয়েছিলেন ঘাটে, আর নিজে চাপকান চোগা

পরতে গিয়েছিলেন বাড়ী। ইতিমধ্যে ইনস্পেক্টর বাইসিকেল চড়ে স্কুলে এসে সামনেই দেখলেন ফার্ষ্ট ক্লাশে হিষ্টরী পড়াচ্ছে রবীন মাষ্টার। দরজায় দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ তিনি শুনলেন, তারপর ক্লাশে ঢুকে পড়লেন।

ক্লাশে ঢুকেই তিনি একটি ছেলেকে বললেন মাষ্টার মশায় যা বলছিলেন তার একটা চুম্বক করতে। রবীন মাষ্টার যা বলেছিল তা সেই ছেলেটি হুবহু বুঝিয়ে দিলে।

রবীন মাষ্টার এতক্ষণ আশা করছিল যে, সে যা বলেছে তা সাহেব শুনতে পায় নি। শুনলেও বাঙ্গালা বোঝে নি কিছুই। কিন্তু ছেলেটিকে যখন সে পরিষ্কার বাঙ্গলায় প্রশ্ন করলে আর ছেলেটির বাঙ্গলা উত্তরও বেশ বুঝলে, তখন আর রবীন মাষ্টারের আশা-ভরসা বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট থাকল না। সে হাত-পা ছেড়ে অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

বোর্ডের উপর ম্যাপ টাঙ্গান ছিল। সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "এখন কি জিওগ্রাফী পড়ান হবে?"

শুষ্ককণ্ঠে রবীন মাষ্টার শুধু বললে, "আজ্ঞে না, হিষ্টরী—রিভিশন।"

সাহেব ছেলেদের পাশে বেঞ্চে বসে বললেন, "আচ্ছা, আপনি পড়ান, শুনি।"

কি সে পড়াবে মাথা-মুণ্ডু? ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে রবীন ম্যাপের কাছে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—"এই জায়গাটা কি?"

একটি ছেলে বল্‌লে, "পাঞ্জাব।"

"এই পাঞ্জাবে প্রথম আর্য্য-সভ্যতার বিকাশ। পাঞ্জাবের পশ্চিমে আফগানিস্তানে, পারস্থে এবং তার চেয়েও দূরে—এই যে দেখছো জায়গাটা, এখানে মিটানী বলে একটা রাজ্য ছিল।" বলেই রবীন

মাষ্টার মিটানী রাজের সঙ্গে হিটাইটদের সন্ধির যে লিপি পাওয়া গেছে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে গেল।

তার মুখ খুলে গিয়েছিল। নিজের বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করতেই সে তার আবেষ্টন ভুলে গেল। ছেলেদের মাঝখানে যে ইনস্পেক্টর বসে আছেন সে কথা আর মনে রইল না।

সে বললে, "যে জাতি এই আর্য্য-সভ্যতা ভারতে এনেছিল, তাদের আগে এ দেশে কি লোক ছিল না? ছিল। তাদের এঁরা বলতেন অনার্য্য। তাদের ভিতর কেউ কেউ ছিল দারুণ অসভ্য। কাঁচা মাংস খেত। আবার অনেকে ছিল খুব বেশী সভ্য। সম্প্রতি বেলুচিস্থানে মহেঞ্জোদাড়ো এবং হরপ্পা নামক দুই জায়গায় মাটি খুঁড়ে দেখা গেছে এমন সব জিনিষ, যাতে বোঝা যায় যে, এইখানে বৈদিক সভ্যতার আগে বাস করত এক মহা সভ্যজাতি—যারা আর্য্য নয়!"

ইনস্পেক্টর লাফিয়ে উঠে বললেন, "স্কুলের কাজ হয়ে গেলে আমি আপনার সঙ্গে কথা কইতে চাই। আপনার নামটা কি জানতে পারি?"

রবীন নাম বললে।

সাহেব বললেন, "আপনি কি হেড-মাষ্টার?"

"আজ্ঞে না, থার্ড মাষ্টার।"

"হুঁ" বলে সাহেব সব তাঁর নোট বইয়ে লিখলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "এম-এ আপনি?"

"আজ্ঞে না, আমি বি-এ পাশ করতে পারি নি।"

সাহেব ভ্রূ কুঞ্চিত করে কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে বললেন "আশ্চর্য্য!" শুনে রবীন মাষ্টারের পিলে চমকে গেল। সে বুঝলে ভারী একটা অপরাধ হয়েছে তার। কিন্তু কি সে অপরাধ? বি-এ পাশ করতে না পারাটা

'আশ্চর্য্য' কিসে? শেষে ভাবলে, বি-এ পাশ না করে সে থার্ড মাষ্টারি করছে, তাই শুনে বোধ হয় সাহেব আশ্চর্য্য হয়েছেন।

ভারি ঘামতে লাগল সে। এদিকে ততক্ষণ হেড মাষ্টার খবর পেয়েছেন যে, ইনস্পেক্টর সাহেব এসে রবীন মাষ্টারের ক্লাসে ঢুকেছেন।

মাথায় হাত দিয়ে হেড মাষ্টার বললেন, "এই খেয়েছে! রবীন-বাবুর চেহারা দেখেই তো সাহেবের মেজাজ যাবে খিঁচড়ে।" মনে মনে প্রমাদ গণে হেড মাষ্টার—তাঁর মাথায় পাগড়ী পরতে পরতে ছুটলেন ফার্ষ্ট ক্লাসে।

ক্লাসে ক্লাসে গিয়ে ব্ল্যাক সাহেব ছোট ছোট খুটিনাটি ধরে মাষ্টার-দিগকে তিরস্কার করলেন আর হেড মাষ্টারকে লাগালেন দু'তিনটা ধমক।

যে ক্লাসে **Nature study** হচ্ছিল, সে ক্লাসে গিয়ে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। খানিকক্ষণ দেখে মাষ্টারকে বললেন, "ইনস্পেক্টরের সার্কুলারে কি এমনি করে শেখাবার বিধান আছে?"

মাষ্টার কাঁপতে কাঁপতে বললে, "আজ্ঞে না, ঠিক এমন নেই।"

"তবে তুমি এ প্রণালী পেলে কোথায়?"

মাষ্টার তার টেবিল থেকে একখানা জীর্ণ বই তুলে সাহেবের হাতে দিলে।

বইখানার নাম পড়ে সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "এই বই কি লাইব্রেরীর, না তোমার নিজের?"

বলতে বলতেই তিনি পাতা উল্টে দেখলেন, বইয়ে নাম লেখা আছে রবীন মাষ্টারের।

বললেন, "তা হলে রবীন মাষ্টারের উপদেশেই তুমি এমনি শিক্ষা দিচ্ছ?"

স্বীকার করতেই হল। মাষ্টার প্রমাদ গণল। হেড মাষ্টার তাড়াতাড়ি বল্লেন, "আমি ভারি দুঃখিত স্যর। উনি যে আমাকে গোপন করে ইনস্পেক্টরের সার্কুলারের বাইরে—"

ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে ইনস্পেক্টর বললেন, "এঁরা যা করছিলেন, সেইটাই ঠিক পদ্ধতি। ইনস্পেক্টররের সার্কুলারে যা আছে তা ঠিক নয়।"

হেড মাষ্টার থ হয়ে গেলেন।

তারপর অফিসে গিয়ে সাহেব কাগজ-পত্র দেখতে লাগলেন। ধমকে ধমকে হেড মাষ্টারের পিলে একদম চমকে দিলেন।

মাষ্টারদের 'লিষ্ট' নিয়ে ইনস্পেক্টর প্রথমেই রবীন মাষ্টারের নাম বের করে দেখলেন, তার মাইনে চল্লিশ টাকা। সাহেবের মুখে বিরক্তির ভাব দেখে হেড মাষ্টার বললেন, "অনেক কাল আছেন উনি, তাই চল্লিশ টাকা পাচ্ছেন, নইলে আগে তিরিশ টাকাই ছিল।"

সাহেব বললেন, "লজ্জার কথা! একে অন্ততঃ একশো টাকা দেওয়া উচিত।"

হেড মাষ্টার আকাশ থেকে পড়লেন। বিস্ময়টা যখন তাঁর হজম হল তখনি তিনি বললেন, "উনি আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট—"

"হলেই বা! এ স্কুলে একটি মাত্র শিক্ষক আছে—সে রবীন।"

হেড মাষ্টার তো হতবাক্!

রবীন মাষ্টারের সন্দেহ ছিল না যে, তাকে আজ বরখাস্ত করবার জন্যেই সাহেব দেখা করতে বলেছেন।

সে থর্ থর্ করে কাঁপতে কাঁপতে সাহেবের প্রতীক্ষা করছিল। ব্ল্যাক সাহেব হেসে বললেন, "এই যে আপনি? এখন বাড়ী যাবেন কি?"

একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে কাঁপতে কাঁপতে রবীন মাষ্টার বললে "আজ্ঞে হাঁ, মানে—হুজুরের হুকুম পেলে—।"

সাহেব তাঁর বাইসিকেল টেনে নিয়ে বললেন, "চলুন, পথে চলতে চলতে আপনার সঙ্গে কথা হবে।"

সাহের তার সঙ্গে কথা কইতে কইতে একেবারে তার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সাহেবের একটি কথা শুনে রবীন আশ্বস্ত এবং উল্লসিত হয়ে উঠল। সাহেব বললেন যে, রবীনের প্রবর্ত্তিত Nature study-র প্রণালীটাই ঠিক প্রণালী, ইনস্পেক্টরের সার্কুলারের প্রণালী ভুল! এ সার্কেলে আর কোনও স্কুলেই সত্যিকারের প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ হয় না।

তাঁকে বাড়ীতে ঢুকতে দেখে রবীন মাষ্টার বললে, "আপনি আমার বাড়ীতে আসবেন?"

সাহেব বললেন, "হ্যাঁ. কোনও আপত্তি আছে কি?"

রবীন গদ্গদ ভাবে বললে,"না, না, আপত্তি কেন থাকবে? সৌভাগ্য আমার।" কিন্তু মনে মনে সে ভাবতে লাগল, কি বিভ্রাটেই পড়া গেল। কোথায় বা সে বসায় সাহেবকে।

সাহেব বললেন, "আপনার পড়বার ঘর কোথায়?"

অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে তার বাইরের ঘর দেখিয়ে রবীন মাষ্টার বললে, "এইখানে।"

সাহেব গট্ গট্ করে ঢুকে কিছুক্ষণ অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলেন। ময়লা অপরিচ্ছন্ন ঘর। তার ভিতর আছে শুধু একটা ময়লা ফরাস। তার সমস্তটা জুড়ে বসেছে পাঁজা পাঁজা বই।

ফরাসের ফাঁকা জায়গাটুকুতে বসে ব্ল্যাক সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা মহেঞ্জোদাড়োর খবর আপনি পেলেন কোথা থেকে? সে তো বেশী দিন বেরোয় নি।"

তখনো মহেঞ্জোদাড়োর কথা স্কুলের বইয়ে ওঠে নি। সে সম্বন্ধে কোনও বইও লেখা হয় নি।

অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে রবীন তার বইয়ের একটা তাড়া নেড়ে-চেড়ে তার ভিতর থেকে টেনে বের করলে একখানা বিলাতী সাপ্তাহিক পত্রিকা। তাতে বেরিয়েছে মহেঞ্জোদাড়ো সম্বন্ধে মস্ত এক প্রবন্ধ।

সাহেব জিজ্ঞেস করে জানলেন যে, এ কাগজ পুরোন বইয়ের দোকান থেকে কেনা।

ক্রমে রবীনের আড়ষ্টতা কেটে গেল। সে ভুলে গেল যে, সে ভুবনমোহন স্কুলের থার্ড মাষ্টার আর সাহেব স্বয়ং প্রবল প্রতাপ ইনস্পেক্টর বাহাদুর! অর্থনীতির নানা বিষয়ে সাহেবের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিল সে।

রবীন মাষ্টারের কথাটা খেয়াল থাকবার কথা নয়, কিন্তু তার বাড়ীতে ইনস্পেক্টর এসেছেন স্কুলের পরে—এ-খবরে অনেকের সঙ্গে নিস্তারিণীও চঞ্চল হয়েছিল। সে তাড়াতাড়ি জমিদারবাড়ী থেকে চায়ের সরঞ্জাম আনিয়ে আর নিজের ঘরের তৈরী কিছু খাবার দিয়ে সাহেবের জন্য পাঠিয়ে দিলে রণুর হাতে।

চা পান করতে করতে সাহেব বললেন, "আপনার সঙ্গে আলাপ করে ভারি খুসী হলাম। সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে এমন পরিষ্কার ধারণা আমি খুব কম লোকের দেখেছি।"

প্রসঙ্গক্রমে সাহেব বললেন যে, তিনি অর্থনীতির অনার্স পেয়ে বিলেত থেকে পাশ করে এসেছেন।

এই নিয়ে আর খানিকক্ষণ আলোচনা করে শেষে সাহেব বইগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখতে দেখতে তার ভিতর থেকে চারখানা বই বেছে নিয়ে বললেন, "এ-বই ক'খানা আমি নিতে পারি কয়েকদিনের জন্যে?"

রবীন হিসেব করলে না যে, কত কষ্টে সে ঐ বই সংগ্রহ করেছে।

কৃতার্থ হয়ে বললে, "নিশ্চয়।" বরং বইগুলি জীর্ণ মলিন বলে সে বড় কুণ্ঠা বোধ করল। যাবার সময় ইনস্পেক্টর বললেন, "আপনি এখানে নিজেকে অপচয় করছেন। আচ্ছা, আমি দেখি কিছু করতে পারি কি না আপনার জন্যে। আর দেখুন, আপনার মাইনে বাড়াবার জন্যে হেড মাষ্টারকেও বলেছি, আমার রিপোর্টেও লিখেছি। যদি ওরা না দেয়, কি অন্ততঃ আশি টাকার কম দেয়, তবে আমাকে জানাবেন।"

সাহেব বাইকে করে চলে গেলেন।

ইনস্পেক্টর যে সবাইকে গালাগালি দিয়ে রবীন মাষ্টারকে এমন সমাদর করে গেছেন, তাতে সবার চোখ টাটিয়ে উঠল। তিনি চলে যাবার পর হেড মাষ্টার বললেন, "সালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর। পাগল সাহেব, পাগল না হলে তাঁর চোখে লাগে ?"

কিছুদিন পর ব্ল্যাক সাহেবের অর্ডার মোতাবেক কলকাতা থেকে এক প্যাকেট বই এল রবীনের নামে। রবীন লোভীর মত সেই বইগুলো নিয়ে মনের আনন্দে পড়তে লাগল।

তার মাইনে বাড়াবার কথা নিয়ে কমিটিতে মাস দুই গবেষণার পর কমিটি সিদ্ধান্ত করলেন, দশ টাকা বাড়ান যেতে পারে। কিন্তু ব্ল্যাক সাহেব তার পরই বদলী হয়ে যাওয়ায় সে সিদ্ধান্ত আর কাজে এল না।

রবীন মাষ্টারের সে দিকে খেয়াল ছিল না। জীবনে প্রথম একটা সত্যিকার পণ্ডিত লোকের কাছে সমাদর পেয়ে কৃতার্থতায় তার অন্তর এত পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে, সে ওসব খেয়ালই করল না।

তারপর যখন ব্ল্যাক সাহেব তাকে মাসে দু' একখানা করে চিঠি লিখে তার সঙ্গে অর্থনীতি সমাজ-তত্ত্বের সমস্যা আলোচনা করতে লাগলেন, তখন আর তার তৃপ্তির সীমা রইল না।

তার এতদিনের অসার্থকতার বোঝা যেন ঝরে পড়ে গেল অঙ্গ থেকে, যৌবনের উৎসাহ যেন আবার ভরে দিল তার অন্তর।

৯

সেবার পূজোর ছুটিতে কলকাতায় গিয়ে একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটল।

'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী'তে বসে সে পড়ছিল আর নোট করছিল। কাজ শেষ করে যখন মুখ তুলে চাইলে, তখন দেখতে পেল যে, তার সামনে বসে একটি মহিলা ঠিক তারই মত কতকগুলি অর্থনীতির বই নিয়ে পড়ছেন।

কৌতূহলী দৃষ্টিতে মহিলাটির দিকে সে ভাল করে তাকিয়ে দেখল। বোধ হয় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বয়স হবে তাঁর। মাথার সামনের চুলগুলো পেকে গেছে। মুখ শীর্ণ। মুখখানা রবীনের চেনা চেনা মনে হল। কিন্তু ঠিক ঠাহর করতে পারল না, কোথায় দেখেছে ওঁকে।

ফেরার সময় সেই মহিলা এবং তাঁর সঙ্গী এক ভদ্রলোক রবীনের সঙ্গে একই ট্রামে উঠলেন। মহিলাটি একবার তার দিকে চোখ তুলে চাইলেন। তাঁকে দেখে এখন রবীনের তড়িৎ বলে মনে হল। তৎক্ষণাৎ সে সেই ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে বললে, "একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি মশায়? আপনার সঙ্গের মহিলাটির নাম জানতে পারি কি?"

ভদ্রলোক তার এ প্রশ্নের স্পর্দ্ধায় অবাক হয়ে উগ্রস্বরে বললেন, "তাতে তোমার কি দরকার?"

অত্যন্ত অপ্রস্তুত হল রবীন মাষ্টার। কাঁচুমাচু হয়ে সে বলল, "ঠিক, বড্ড অপরাধ হয়ে গেছে, মাপ করবেন। আমি ভেবেছিলাম, আমি একটি মেয়েকে চিনতাম—মানে পড়াতাম⋯"

মহিলাটি তার দিকে তাকিয়ে শুনছিল, সে হঠাৎ বলে উঠল, "আপনি কি রবিবাবু?"

রবীন মাষ্টার হেসে বললে, "তা হ'লে আপনিই তড়িৎ!"

মহিলাটি এগিয়ে এসে রবীন মাষ্টারের হাত ধরে উৎফুল্ল নয়নে তার মুখের দিকে চেয়ে বললে, "কি সৌভাগ্য! অপনি এখানে কোথায় আছেন? কতদিন আছেন?"

রবীন উত্তরে হড়বড় করে অনেক কথা বললে। তার আর আনন্দের সীমা নেই।

তড়িতের স্বামী বললে, "আমার বেয়াদপী মাপ করবেন। আমি চিনতে পারি নি।"

রবীন হো-হো করে হেসে বললে, "এ আর বেয়াদপী কি? আপনি আমায় চিনবেনই বা কি করে? আমার সঙ্গে তো আপনার কোনদিন দেখা হয় নি।"

তারা রবীন মাষ্টারকে টেনে নিয়ে গেল তাদের বাসায়। খাইয়ে দাইয়ে গল্প গুজব করে তাকে বিদায় দেবার সময় তড়িৎ বললে, "কাল সকালেই আসবেন কিন্তু বাক্স-বিছানা নিয়ে। মাত্র তো আর পনেরটা দিন থাকবেন—এর ভিতর এক দণ্ডও আপনাকে ছাড়ছি নে।"

আনন্দে রবীন মাষ্টারের মাথাটা যেন ঘুরপাক খেতে লাগল। তড়িৎ তাকে মহা সমাদর করেছে। সেই ধ্যানে একেবারে মশগুল হয়ে সে হাওয়ার উপর চলতে লাগল।

তড়িৎ এবং তার স্বামী দুজনেই দিল্লীতে চাকরী করে। সুকেশ

ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টে আর তড়িৎ সেখানকার মেয়েদের কলেজের অধ্যাপিকা। তারা কয়েক মাসের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছে। বড় ছেলে সঙ্গে আছে, আর সব ছেলে-পিলেরা দেশে গেছে তড়িতের বাপ-মার সঙ্গে।

তড়িৎ পড়ায় অর্থনীতি, শুনে রবীন মাষ্টার ভারী আশ্চর্য্য হয়ে গেল। বললে, "আশ্চর্য্য তো, আপনিও আমারই মত অর্থনীতি চর্চ্চা করেন!"

তড়িৎ সে কথার উত্তরে হেসে বলল, "আমার মনের গতি যে আপনার মতই হবে সে আর এত আশ্চর্য্য কি? আমার মনের সুর যে আপনিই বেঁধে দিয়েছিলেন।"

পরের দিন রবীন তল্পী-তল্পা নিয়ে তড়িতের অতিথি হল।

নানা বিষয়ে গল্প আলোচনা হল সারা সকাল। সেই সব আলোচনার মধ্য দিয়ে সুকেশ বুঝল,—রবীন চিন্তাশীল ভাবুক মানুষ। পাণ্ডিত্যও তার কম নয়। এইভাবে কথায় কথায় বেলা হয়ে গেল।

তড়িৎ রবীনকে স্নান করতে বলে তার ব্যাগের চাবিটা চাইল।

রবীন বললে, "চাবি তো নেই ব্যাগের!"

"তাই না কি!"—বলে ব্যাগটা খুলতে গেল তড়িৎ।

মহা আপত্তি করে রবীন তাকে বাধা দিলে। তড়িৎ বললে, "সরুন বলছি, নইলে ভাল হবে না কিন্তু।"

ব্যাগ খুলে তড়িৎ দেখলে তাতে আছে কয়েকখানা পুরনো বই, কয়েকটা নোটের খাতা, একখানা ময়লা কাপড় আর একটা ফরসা জামা।

রবীনের দিকে চেয়ে সে বললে, "এই না কি আপনার সব কাপড়-চোপড়?"

রবীন লজ্জায় মাথা নীচু করে রইল।

রবীনের থলি খুলে তড়িৎ দুটো টাকা বের করলে। তারপর বড় ছেলেকে ডেকে তার হাতে লুকিয়ে আরও পাঁচটা টাকা দিয়ে বাইরে পাঠাল। ছেলে বাইকে চড়ে মিনিট পনেরোর ভিতর একজোড়া মিলের ধোয়া ধুতি, একজোড়া তোয়ালে আর একজোড়া গেঞ্জি নিয়ে এল। সেই কাপড় গেঞ্জি আর ব্যাগের ভিতরকার ফরসা জামাটা নিয়ে তড়িৎ রবীনকে বাথরুমের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল।

এর পর তড়িৎ রবীনকে তাড়িয়ে বেড়াতে লাগল। নাপিত ডেকে তার চুল কাটালে আর দাড়ি ছাঁটালে এবং স্নানের পর চিরুণী-বুরুশ এনে দিলে তাকে চুল আঁচড়াতে।

দরজির দোকানে জরুরী অর্ডার দিয়ে তৈরী হল রবীনের ছটা পাঞ্জাবী, এল আর এক জোড়া ধুতি। তার দাম তড়িৎ বের করলে রবীনের মনিব্যাগ থেকেই কিন্তু তার সঙ্গে তড়িতের যে কতটাকা গেল তা রবীন জানল না। তাতে সে ব্যাগের গর্ভ এত ক্ষীণ হয়ে উঠল যে রবীনের বুক কাঁপতে লাগল। চল্লিশটে টাকা সে বহু কষ্টে সঞ্চয় করেছিল। এসেছিল সে থার্ডক্লাসে, থাকত একটা হোটেলে—যেখানে দিন ছ'আনায় চলে। বাকী টাকা সে রেখেছিল বই কিনবে বলে। কিন্তু সে বুঝতে পারলে যে, বই কেনা এই সব অপব্যয়ের ফলে আর হবে না।

বুক কাঁপল বটে, কিন্তু অপূর্ব্ব কৃতার্থতায় ভরে উঠল তার চিত্ত।

দুপুর বেলায় খেয়ে দেয়ে তড়িৎ তাকে নিয়ে 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে যায়। রবীন সঙ্গে যায় বলে সুকেশকে আর তড়িতের সঙ্গে যেতে হয় না। তার যেতে হত সুধু তড়িৎ একলা বেরুতে পারে না বলে। লাইব্রেরীতে সারাদিন কাজ করে তারা বাড়ী ফেরবার

সময় বেশ একটু ঘুরে-ফিরে বেড়িয়ে আসত। রবীন তড়িৎকে দীক্ষিত করে ফেলল পুরনো বইয়ের দোকানে বই ঘাঁটার মন্ত্রে। সেখানে এত ভাল ভাল বই এত সস্তায় পাওয়া যায় দেখে অবাক হয়ে গেল তড়িৎ। অনেকগুলো বই কিনে ফেলল সে।

বাড়ী ফিরে তড়িৎ নিজে রান্না করে। তার পর চলে গল্প-গুজব। রাত্রে খাওয়ার পরও অনেক রাত পর্য্যন্ত তাদের আড্ডা-আলোচনা হয়।

রবীনের অন্তর যেন আনন্দে উপচে পড়তে লাগল। জীবনে যে এত সুখ, এত সৌভাগ্য, এত আরাম, এত আনন্দ সম্ভব, তা সে কোন দিনও জানত না।

একটি একটি করে তার এ-কয় বৎসরের জীবনের সবগুলি কথা রবীন প্রকাশ করে ফেললে তড়িতের কাছে।

একদিন গভীর রাত্রে রবীনের দুঃখময় জীবনের কাহিনী শুনতে শুনতে তড়িতের চোখ ভরে উঠল অশ্রুতে।

দু'দিন বাদে ভাই ফোঁটা, তার পরের দিন স্কুল খুলবে। তাই ভাই ফোঁটার আগের দিন যেতেই হয় অথচ যেতে তার মন সরে না। কিন্তু যেতে যে হবেই।

তড়িৎ আপত্তি তুলল। ভাই ফোঁটার আগে তার কিছুতেই যাওয়া হবে না। সে বললে, "একদিন ছুটি নিন।"

এ কথা ভাবতে রবীনের ভয় হল। একটি দিন ছুটি চাইলেও যে হেড মাষ্টার তাকে কি নাকাল করবেন সেই ভাবনায় সে অস্থির হয়ে উঠল।

তড়িৎ বসল টাইম-টেবল নিয়ে হিসেব করতে। দেখা গেল যে ভাই ফোঁটার দিন বিকেলের দিকে একটা ট্রেনে গিয়ে তিন জায়গায়

চেঞ্জ করে বাকী রাস্তাটা মোটরে গেলে রবীন স্কুল বসার এক ঘণ্টা আগে বাড়ী পৌছুতে পারে। সুতরাং এর পর আর আপত্তি চলল না।

মহা আড়ম্বর করে তড়িৎ রবীনকে ভাই ফোঁটা দিলে। আর ফোঁটার সঙ্গে দিলে দু'জোড়া ধুতি, দু'টো পাঞ্জাবী, আর দু'খানা চাদর।

খাওয়া-দাওয়ার পর যখন রওনা হবে তখন রবীন বলল, "এইবার আমার ব্যাগটা—"

তড়িৎ বললে, "সেটা পাবেন না। ওটা থাক আমার কাছে। রবীন দেখতে পেল যে তার সঙ্গে গাড়ীতে উঠছে ঝক্‌ঝকে চামড়ার নূতন দু'টো স্যুটকেশ। একখানার ভিতর আছে তার কাপড়-চোপড়, আর একখানায় তার স্ত্রী ও ছেলেপিলের পোষাক-পরিচ্ছদ। এতদিন তড়িৎ তার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে যত বই কিনেছিল সেগুলোও সব সে দিয়ে দিয়েছে এর মধ্যে। রবীনের চোখের জল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

তড়িৎ তাকে গড় হয়ে প্রণাম করে চোখের জল মুছতে মুছতে খুব মৃদুস্বরে বললে, "কোনও দিন ভাবি নি,—আপনার সঙ্গে দেখা হলে এত কষ্ট পাব। এত দুঃখে আছেন আপনি, ভাবতে বুক ফেটে যায় আমার।" চোখ মুছতে মুছতে রবীন গিয়ে উঠল গাড়ীতে।

## ১০

রবীন মাষ্টার যখন গাঁয়ে ফিরে এল তখন তাকে চেনাই দায়। বেশ দুরস্ত চুল-দাড়ী, সেই ছেঁড়া-ময়লা ছিটের কোট আর ধুতির বদলে তার পরনে পরিষ্কার সাদা ধুতি, পাঞ্জাবী এবং চাদর। দেখে সবাই অবাক্ হয়ে গেল।

কিন্তু ভিতরের পরিবর্ত্তনের কাছে সেই বাইরের পরিবর্ত্তন

কিছুই নয়। তার জীবন এত দিন ছিল পুঞ্জীভূত ব্যর্থতার বোঝা। প্রথমে ব্ল্যাক সাহেব এবং তারপর স্বয়ং তড়িৎ ও তার স্বামী পাণ্ডিত্যের আদর করে তার আত্মাদর, সাহস ও স্ফূর্ত্তি এতটা বাড়িয়ে দিয়েছে যে, তাতে রবীন মাষ্টারের মনে নবজীবনের সঞ্চার হয়েছে। এই পরম সার্থকতার আনন্দে সব ব্যর্থতা তার ধুয়ে-মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

উষর মরুভূমির মত নীরস, তপ্ত, জ্বালাময় ছিল তার জীবন। মরু-ঝড়ের মত মাঝে মাঝে তার বুকের ভিতর হু হু করে উঠত। একটা স্থির, স্তব্ধ, শুষ্ক, উগ্র তাপ তার অন্তরের তলা পর্য্যন্ত ঝাঁজরা করে দিত।

কিন্তু আজ হঠাৎ তার জীবনের চেহারা বদলে গেছে। পৃথিবীতে অন্ততঃ একটি মানুষ তাকে বড় ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, মর্য্যাদা দেয়।

কি অপূর্ব্ব তড়িতের সে প্রীতি! স্নিগ্ধ, পবিত্র, নির্ম্মল। কোন ক্লেদ বা গ্লানি নেই তাতে।

দেবতার মত স্বামী তার, চাঁদের মত ছেলে-পিলে, ছবির মত পরিচ্ছন্ন সুন্দর তার গৃহস্থালী। সুখের উপাদানের কোন অভাবই নেই। স্বামীকে সে ভালবাসে। ছেলে-পিলেদের নিয়ে সে তন্ময়। তাকেই কি কম ভালবাসে তড়িৎ? কতদিন বাদে দেখা। অন্য কেউ হলে হয়ত চিনতেই পারত না। আর চিনলেও এত আদর আপ্যায়ন নিশ্চয়ই করত না। ছেলেবেলার শিক্ষাগুরুকে বড় হয়ে কজনই বা মনে রাখে। তড়িৎ কিন্তু ভোলেনি। শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং প্রীতির বন্যায় তাকে একেবারে ভাসিয়ে দিয়েছে। এ একটা পবিত্র স্বর্গীয় প্রীতি, যার গরিমার সীমা নেই।

জীবনের একটা মানে সে খুঁজে পেয়েছে, সার্থকতার স্বাদ পেয়ে সে কৃতার্থ হয়ে গেছে। নূতন উৎসাহ, নূতন উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ

তার চিত্ত, সাহসে ভরে গেছে তার প্রাণ। আশাশূন্য যে নিরর্থক জীবন সে বহন করে এসেছে এতদিন তা যেন কোথায় লুকিয়ে পড়েছে। রবীন মাষ্টার আবার চাঙ্গা হয়ে কাজে লেগে গেল।

বরাবরই তার মনে নতুন কিছু করবার পরিকল্পনা জেগে উঠত। কিন্তু ইদানীং সে কোন কিছুতেই মাথা গলাত না। ভাবত কি হবে ছট্‌ফট্ করে? কিছুই হবার নয়। এ ধড়ফড়ানি মিথ্যে। এতদিন যেমন কেটেছে, জীবনের বাকী কয় বছরও তেমনি কেটে যাবে।

কিন্তু তার এ নবজীবন লাভের সঙ্গে সঙ্গে নতুন সঙ্কল্পগুলো আবার মাথা খাড়া করে উঠতে লাগল। তড়িতের সংসারে পনের দিন বাস করে তার মনে হয়েছিল, অতটা স্বচ্ছলতার সংসার তার হবে না কোনও দিন। কিন্তু তার যে সামান্য সম্বল, তা দিয়েও অনেক পরিচ্ছন্ন হয়ে বাস করা যায়। তড়িৎ তাকে এ সম্বন্ধে অনেক উপদেশও দিয়েছিল। রবীন কাপড়-জামা ছাড়তেই তড়িৎ তখনি সেগুলো সাবান দিয়ে কেচে শুকোতে দিত। কাজেই কাপড়ে এক বিন্দু ময়লা থাকত না কোন দিন। তড়িৎ এবং তার স্বামী বাড়ীর দরজা-জানালা, তৈজসপত্র নিজহাতে ঝেড়ে পুঁছে পরিষ্কার করত। তা দেখে রবীনের মনে হয়, এই সামান্য কাজ করে তার পক্ষেও পরিচ্ছন্ন ভাবে থাকা সম্ভব। শুধু সম্ভব নয়, এ তার কর্ত্তব্য।

শিক্ষার প্রণালী নিয়েও অনেক কথা হয়েছিল তড়িতের সঙ্গে। সে কেন ছেলেদের নিয়ে সেই প্রণালীতে কাজ করতে চেষ্টা করবে না? হেডমাষ্টারের এক হুমকী খেয়ে সে কেনই বা স্কুলের হিত চিন্তা ছেড়ে দিয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে? এ স্কুল তো তারই কল্পনা। সে কেন একে নিজের মনের মত করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করবে না? মনে পড়ল, একদিন সে দু'টি শিক্ষককে সামান্য দু'টো

কথা বলে দিয়েছিল। তাতেই তাদের শিক্ষার রকম এত বদলে গেছে যে ব্ল্যাক সাহেব পর্য্যন্ত তারিফ করে গেছেন। এমনি করে সে কেন সব শিক্ষককে শিক্ষা দিয়ে ছেলেদের উন্নতির চেষ্টা করবে না ?

তার মনে হল যে, গ্রামের আর্থিক উন্নতির জন্যে যে প্ল্যান সে করেছিল, সেটা ভয় পেয়ে ছেড়ে দিয়ে সে অন্যায় করেছে।

বাড়ীতে এলে তার চেহারা দেখে নিস্তারিণী চমকে গেল। হেসে বলল, "ইস্, এবার যে কলকাতা গিয়ে বাবু হয়ে এসেছ দেখছি।"

হেসে রবীন মাষ্টার উত্তর করলে, "হ্যাঁ গো, আর তোমাকেও বাবু করবার জোগাড় নিয়ে এসেছি।"

দু'টো স্যুটকেশ দেখে নিস্তারিণী বললে, "এ গুলো কার ?"

হাসিমুখে বিজয় গর্ব্বে রবীন মাষ্টার বললে, "আমারই।"

নিস্তারিণীর মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়ল। কলকাতা গিয়ে রবীন মাষ্টারের কি পাগলামীর ঝোঁক হয়েছিল ? টাকাগুলো না-জানি কি তছ্‌নছ করে এসেছে। জিজ্ঞেস করলে, "কত হয়েছে এ দু'টো ?"

খুব হেসে রবীন মাষ্টার বললে, "কিছুই না, এ দু'টো প্রেজেণ্ট পেয়েছি।"

"প্রেজেণ্ট ! সে কি ?"

"উপহার।—বলছি সব, আগে চল দেখাই।"

ভুল করে প্রথমে সে খুলে বসল বইয়ের বাক্সটা। বই দেখে নিস্তারিণী চোখ কপালে তুলে বললে, "এত বই তুমি কিনেছ ? কতগুলো টাকা জলে ফেললে শুনি।"

"এক পয়সাও নয়। এ সবই প্রেজেণ্ট।"

তারপর কাপড়ের বাক্স খোলা হল। তা থেকে রবীনের নিজের কতকগুলো কাপড়-জামা চাদর বের হল। নিস্তারিণী একটু শ্লেষের সুরে বললে, "এও কি 'প্রেজেণ্ট' না-কি ?"

রবীন ঢোঁক গিলে বললে, "প্রায়।"

তারপর বের হল নিস্তারিণীর শাড়ী, সেমিজ, ব্লাউজ, আর ছেলেদের কাপড় জামা।

শান্তিপুরে শাড়ী এবং সেমিজ-ব্লাউজ দেখে নিস্তারিণী হাসিমুখে বললে, "এ সব কার জন্যে ?"

রবীন বললে, "তোমার জন্যে।"

হেসে নিস্তারিণী বললে, "দূর ! পাগল না-কি তুমি ? এ সব পরবার বয়স কি আছে আমার ?"

"যথেষ্ট আছে। যে এ সব দিয়েছে, সে তোমার চেয়ে বড়, আর এর চেয়ে ঢের জমকাল শাড়ী-জামা সে পরে।"

"কে সে ?"

যথাসম্ভব নির্ব্বিকার চেহারা করে রবীন বললে, "একটি মেয়েকে ছেলেবেলায় আমি পড়াতাম। এখন সে মস্ত বড়লোক। আমার সঙ্গে কলকাতায় হঠাৎ দেখা হল। সে তোমাদের জন্য পূজোর কাপড় আর আমাকে ভাই-ফোঁটার উপহার দিয়েছে।"—শুনে আশ্বস্ত হল নিস্তারিণী।

## ১৯

রবীন মাষ্টারের নব কলেবর দেখে ছেলেরা কাণাকাণি করতে লাগল, মাষ্টারেরা রসিকতা আরম্ভ করলেন। ওসব শোনবার বা গ্রাহ্য

করবার মত মনের অবস্থা তার ছিল না। হেডপণ্ডিত মশায় একটা উদ্ভট শ্লোক আউড়ে তাকে বললেন, "রবিদা, সবই তো করলে, এক শিশি কলপ নিয়ে এলে না কেন?" রবীন বলল, "আমি কি করি না করি তা নিয়ে আপনাদের এত মাথা ব্যথা কেন?" দম দম করে চলে গেল সে নিজের ক্লাসে।

টিফিনের ঘণ্টায় আফিসে গিয়ে খবর পেল হেডমাষ্টার তাকে ডেকেছেন। অমনি তার মনে হল যে, হেডপণ্ডিত হয়ত হেডমাষ্টারের কাছে গিয়ে তার নামে নালিশ করেছে, তাই এ ডাক। রুক্ষ মেজাজে, উগ্র-মূর্ত্তিতে 'যুদ্ধং দেহি'-র মত ভাব করে সে গিয়ে হেডমাষ্টারের কাছে উপস্থিত হল।

গিয়ে দেখলে ব্যাপার অন্যরকম।

ব্ল্যাক সাহেব তাঁর ইনস্পেক্‌শন-রিপোর্টে স্কুলের খুব বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছিলেন। গেল দশ বছরের মধ্যে স্কুলের ছাত্রদের পরীক্ষার ফল যে ক্রমশই খারাপ হতে হতে এখন একেবারে যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে তা দেখিয়ে তিনি বহু দোষ-ত্রুটির আমূল সংস্কারের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেই রিপোর্টে তিনি রবীন মাষ্টারের বহু সুখ্যাতি করে বলেছিলেন যে, রবীন মাষ্টারকে স্কুলের কর্ত্তৃত্বের সকল ভার থেকে সরানোর ফলেই স্কুলের এই অধোগতি। তাঁর একটি প্রস্তাব এই যে, রবীন মাষ্টারকে একশ' টাকা বেতনে এ্যাসিষ্টাণ্ট হেডমাষ্টার নিযুক্ত করে স্কুলের সব শ্রেণীর শিক্ষা পরিদর্শনের ভার প্রধানতঃ তার হাতেই দেওয়া হোক।

ব্ল্যাক সাহেব ইনস্পেক্টর থাকতে থাকতেই হেডমাষ্টার এ রিপোর্টের একটা উত্তর দিয়ে বলেছিলেন যে, ইনস্পেক্টরের সমস্ত প্রস্তাবই কার্য্যে পরিণত করার ব্যবস্থা হচ্ছে, আর রবীন মাষ্টারের মাইনে বাড়ান

সম্বন্ধেও কমিটি বিবেচনা করছেন। অনেক টাল-বাহানা করে কমিটি রবীন মাষ্টারের পঞ্চাশ টাকা বেতন ধার্য্য করেছিলেন, কিন্তু সেই সময়ে ব্ল্যাক সাহেব বদলী হয়ে যাওয়ায় সে প্রস্তাব উল্টে যায়। ব্ল্যাক সাহেবের অন্য প্রস্তাবগুলির সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু করা হয় নি। সবাই ভেবেছিলেন ব্ল্যাক সাহেব একটা বদ্ধ পাগল। তাঁর ঐ সব পাগলামী তাঁর পরের স্থায়ী ইনস্পেক্টর ধরবেন না।

ব্ল্যাক সাহেবের জায়গায় এলেন একজন নিরীহ ভালমানুষ ইনস্পেক্টর।

রবীন মাষ্টার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, তার মাইনে-সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ কি করেন তা সে ব্ল্যাক সাহেবকে জানাবে। ব্ল্যাক সাহেব তখন সিমলায় স্পেশাল ডিউটিতে। সুতরাং তাঁকে জানিয়ে বিশেষ কিছু কাজ হবে তা তার মনে হয় নি, তবু প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য রবীন মাষ্টার কথাটা জানিয়েছিল।

ব্ল্যাক সাহেব সে চিঠি পেয়েই চটে উঠলেন। তিনি তখনি ডিরেক্টরের কাছে একখানা বিস্তারিত পত্র লিখে দিলেন। ডিরেক্টর সেই পত্র ইনস্পেক্টরকে পাঠিয়ে খুব কড়া হবার উপদেশ দিলেন।

তাই ইনস্পেক্টর খুব কড়া একখানা চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে, ব্ল্যাক সাহেবের রিপোর্টে যে সব সংস্কারের কথা বলা হয়েছে সেগুলি এখনও কার্য্যে পরিণত না হওয়ায় একটা গুরুতর ত্রুটি হয়েছে, এবং একমাসের মধ্যে সমস্ত সংস্কার করবার রিপোর্ট না পেলে সরকারী সাহায্যের টাকা দেওয়া হবে না।

এই চিঠি পেয়ে হেডমাষ্টার এবং স্কুল-কমিটি একেবারে বেসামাল হয়ে পড়লেন। সরকারী সাহায্যের টাকা না পেলে তাঁদের চলবে না। অথচ তা পেতে হলে যে সব সংস্কার করতে হবে তাও দুরূহ। আর সব

বিষয় এক রকম জোড়া-তালি দিয়ে চলে, কিন্তু সব চেয়ে বেশী শক্ত কথা সেকেণ্ড মাষ্টারকে ডিঙ্গিয়ে রবীন মাষ্টারকে এ্যাসিষ্টাণ্ট হেডমাষ্টার করা।

রবীন মাষ্টার আসতেই হেডমাষ্টার সৌজন্যের আতিশয্যে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা করে আর একখানা চেয়ারে বসালেন।

"মহা বিপদে পড়েছি রবিবাবু, তাই আপনার শরণ নিতে হচ্ছে। এই দেখুন ইনস্পেক্টরের চিঠি. আর এই আপনার ব্ল্যাক সাহেবের রিপোর্ট। পড়ে দেখুন।"

চিঠি ও রিপোর্ট পড়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করে রবীন মাষ্টার বললে, "তা আমি এর কি করব?"

হেসে হেডমাষ্টার বললেন, "সে কি কথা? আপনারই তো সব করবার কথা। আপনারই তো এই স্কুল। এটা থাকলে আপনার অমর কীর্ত্তি থাকবে, উঠে গেলে আপনার একটা কীর্ত্তি লোপ পাবে। এখন যা বিপদ, তাতে তো স্কুল না থাকবার সামিল! একে বসিয়েছেন আপনি, এর বাঁচবার উপায়ও আপনাকে করতে হবে।"

কথাগুলি বেশ তৃপ্তিদায়ক। যে হেডমাষ্টার রবীন মাষ্টারকে তাড়াবার জন্যে না করেছেন এমন কাজ নেই আর কেড়ে নিয়েছেন তার হাত থেকে সব কাজ করবার শক্তি, তিনিও আজ বিপদে পড়ে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন যে. রবীন মাষ্টারই স্কুলের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছিল আর একে রক্ষা করতে হলেও তাকে ছাড়া গতি নেই। অন্তরে বেশ জয়ের উল্লাস অনুভব করল রবীন।

"আমায় কি করতে হবে?" প্রশ্ন করল সে।

হেডমাষ্টার বললেন, "আপনি যদি ব্ল্যাক সাহেবকে একখানা চিঠি

লিখে দেন, তবে তাঁর অনুরোধে ইনস্পেক্টর আমাদের অন্ততঃ বছর-খানেক সময় দেবেন নিশ্চয়।"

রবীন মাষ্টার বললে, "বাপরে! ব্ল্যাক সাহেবকে আমি এত বড় স্পর্দ্ধার কথা লিখতে পারব না। তা ছাড়া, তিনি বোধ হয় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এখন কোথায় আছেন, তাও জানি না আমি।"

হেডমাষ্টার বললেন, "তা হলে আপনিই বলুন, কি করে এ বিপদে রক্ষা পাই আমরা।"

কেমন করে যথাসম্ভব সহজে এবং সংক্ষেপে ব্ল্যাক সাহেবের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা যায়, সে সম্বন্ধে পরামর্শ দিল রবীন মাষ্টার। প্রত্যেকটা কথা শুনে হেডমাষ্টার বললেন, "ঠিক, ঠিক। চমৎকার কথা। এইটে আমাদের খেয়াল হয় নি।"

তারপর এল লাইব্রেরী আর রবীন মাষ্টারের প্রশ্ন। হেডমাষ্টার বললেন, "এ দুটোর সম্বন্ধে কি উপায়? এমনিই দু'-তিনশ' টাকা ঘাটতি হয়, এর উপর এ খরচা করি কেমন করে?"

রবীন মাষ্টার লাইব্রেরীর নূতন বইয়ের প্রস্তাবিত ফর্দ্দের উপর চোখ বুলিয়ে বললে, "এর মধ্যে• বেশীর ভাগ বই-ই আমার কাছে আছে বোধ হয়। আমার এখন সেগুলোর বেশী দরকার পড়ে না, আপনারা এনে রাখতে পারেন।"

"ব্যস্, তবে আর চাই কি? অমনি কি বলেছিলাম মশায় যে আপনি ছাড়া আর কে রক্ষা করতে পারবে? তারপর আপনার প্রমোশনের কথাটা—এ সম্বন্ধে কি করা যায়?"

"ও সম্বন্ধে কি আর করা যায়!"

"সে কি কথা রবীনবাবু, এত করে আপনি এইটুকুর জন্যে নির্দ্দয় হবেন? এ সম্বন্ধে আপনি ছাড়া কেউ কিছু বলতেই পারে না।

ব্ল্যাক সাহেব যা বলেছেন সে অতি অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনাকে একশ' টাকা কেন, দু'শ' টাকা দিলেও আপনার উপযুক্ত হয় না। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের আর্থিক অবস্থা। উপায় নেই। এখন আপনি দয়া করে ছেড়ে দিলে এর উপায় হয়। ধরুন, আপনি যদি একখানা চিঠি লেখেন যে, স্কুল আপনার নিজের, এর ক্ষতি-বৃদ্ধিতে আপনার অন্তরের যোগ আছে। সেই দিকে দৃষ্টি রেখে আপনি এখন কোনও বেতন-বৃদ্ধি চান না, তবেই সব গোল মিটে যায়।"

রবীনের অন্তর একবার বিদ্রোহী হয়ে উঠল। সে মনে মনে ভাবলে, সব দিক রক্ষার আরও তো সহজ উপায় আছে। হেডমাষ্টার তাঁর দেড়শ' টাকা মাইনে থেকে পঞ্চাশ টাকা ছেড়ে দিলেই তো পারেন। কিন্তু হেডমাষ্টারের মুখের উপর এমন কথা বলতে পারল না সে। সে শুধু ঘাড় নেড়ে বললে, "দেখুন, সে কথাটা তো সত্যি হবে না। স্কুল আমার নয়, আপনাদের কমিটির। এর কাজ পরিচালনায় আমার কোনও হাত নেই। আমি শুধু থার্ড মাষ্টার—আপনার হুকুমে ছেলেদের হিষ্টরী-হাইজিন পড়াই, এত বড় লম্বা কথা বলার স্পর্দ্ধা আমার নেই!"

হেডমাষ্টার দেখলেন যে, খুব সহজে এ কাজটা হাসিল হবে না। তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, "সে কথা নয়। আপনি ভুল বুঝবেন না। সে বিষয়ে আমাদের এতদিনকার ত্রুটি নিশ্চয় সংশোধন করব। আপনাকে স্কুল-কমিটির মেম্বার করে নিচ্ছি, আর সমস্ত স্কুলের পরিদর্শনের ভার দিচ্ছি এখনি। যদি আপনি চান, তবে আপনাকে অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেডমাষ্টার করতেও আমাদের আপত্তি নেই। আপনি দয়া করে বেতন বৃদ্ধিটা স্কুলকে ভিক্ষা দিন।"

রবীন মাষ্টার এতে খুসী হয়ে গেল। টাকা দু'-দশটা নাই-বা পেল, কিন্তু এই অধিকারে সে স্কুলটা নিজের মত করে চালাতে পারবে। কাজের মত কাজ দেখিয়ে যেতে পারবে।

সে তখনি সম্মত হয়ে হেড্‌মাষ্টারের নির্দ্দেশ-অনুযায়ী স্কুলের হিতের জন্য বেতন-বৃদ্ধি চায় না বলে চিঠি লিখে দিলে।

খুব উৎফুল্ল হৃদয়ে বাড়ী ফিরল সে।

সেইদিন কমিটি থেকে সব পাশ হয়ে গেল। যোগেশ হেসে বললে, "কেমন করে বাগালেন এ চিঠি?"

হেডমাষ্টার হেসে বললেন, "রবীন মাষ্টারকে তোয়াজ করে ল্যাজ মোটা করে দিতেই সে একেবারে চিৎ—যা বললাম তাই করলে। পাগল মানুষ, ওকে একটু খোসামোদ করলে কি না করান যায়।"

## ১২

রবীন মাষ্টার দেখলে চারদিক দিয়েই যেন তার অদৃষ্ট খুলে যাচ্ছে এতদিনে। স্কুলে মাইনে না-ই বাড়ুক, তার কাজ করবার ক্ষমতা বেড়ে যাবে। আধিপত্য হবে একটা—যার ফলে সে তার আদর্শগুলো কাজে পরিণত করতে পারবে। বাড়ীতে নিস্তারিণী আর রবীনকে ঘাঁটায় না, সময়ে অসময়ে তার হুকুম নিয়ে হাজির হয় না, রবীন নিজের মত নিজে তার বাইরের ঘরে বসে যা ইচ্ছে করতে পারে। তাই সে বাইরের ঘরের বইগুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে বেশ ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন করে ফেললে।

আবার এ-দিকে চাষীরাও তার কাছে খুব আসতে লাগল।

পাটের দর এবার এত পড়ে গেছে যে, পাট জন্মাবার খরচাও পোষায় নি কারও। তাই চাষীরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে সবাই। তারা ভেবে দেখলে যে, এর চেয়ে পাটের জমিগুলো ফেলে রাখলে তাদের লোকসান হত কম। কারও কারও মনে পড়ল যে, রবীন মাষ্টার পাটের জমি কমিয়ে অন্য ফসল বুনতে বলেছিল। হোক মাষ্টার পাগল, কিন্তু সে বলেছিল ঠিক—আর সে জানে অনেক কথা।

তাই চাষীরা একে একে এবং দলে দলে তার কাছে আসতে লাগল পরামর্শের জন্যে। উৎসাহে ভরে উঠল রবীন মাষ্টারের অন্তর। এতদিনে বুঝি তার স্বপ্ন সফল হবে।

দিনের পর দিন তার বাড়ীতে বৈঠক বসতে লাগল। প্রতি জনের কাছে একই কথা বার বার বলতে তার মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে গেল, কিন্তু উৎসাহ তার কমল না।

বাঙ্গলার চাষী জমিতে দু'বার চাষ দিয়ে দু'টো বীচি ছড়িয়ে আসে, দু'-একবার নিড়ানি দেয়, তারপর ফসল হলে কেটে ঘরে তোলে। পাট করতে তাদের খাটতে হয়, কিন্তু মাত্র সামান্য কয়েক দিন। এর বেশী তাদের কিছুই করতে হয় না। বাকী বছরটা তারা বেকার থাকে।

ধীরে-সুস্থে, টেনে, লম্বা হয়ে চলতে লাগল চাষীদের সঙ্গে রবীনের আলোচনা। চট্-পট্ একটা সিদ্ধান্ত হবার কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। একদিন যদি-বা দশজনে মিলে একটা কিছু ঠিক করে, তার পরের দিন আর দু'জনা এসে দেয় সেটা ভণ্ডুল করে। আবার যদি নতুন লোক রাজী হয়, তবে পুরনোরা যায় বিগড়ে।

এই সব গবেষণা হতে হতে বীজ বুনানর সময় হঠাৎ পাটের

দাম বাড়তে থাকল। চাষীরা চট্-পট্ যে যার জমিতে একটু বেশী করে পাট বুনানী করলে। তার পর রবীন মাষ্টারের কাছে তাদের আনাগোনা বন্ধ হয়ে গেল।

রবীন মাষ্টার নিরাশ হয়ে অখণ্ড মনোযোগ দিতে গেল স্কুলে। শিক্ষা-পদ্ধতির কি কি উন্নতি করা দরকার সে কথা ভাবতে আরম্ভ করলে। এ-বিষয়ের চর্চ্চা সে অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছিল ; তাই কোন কিছু করবার আগে সে তার পুরনো বইগুলো ঝাড়া-ঝুড়ি করে আবার একবার পড়ে নিলে। ক্লাসে ক্লাসে ঘুরে পড়ান দেখতে লাগল। মতলবটা এই যে, দেখে শুনে তবে তার পদ্ধতি স্থির করবে।

সেকেণ্ড মাষ্টার গিয়ে হেডমাষ্টারকে বললেন, "পাগলের জ্বালায় অতিষ্ঠ হলাম!"

হেডমাষ্টার বললেন, "কেন? কি হয়েছে?"

"আরে মশাই, ক্লাসে পড়াই, দু'-চারদিন অন্তর দেখি, ও দাঁড়িয়ে শুনছে দোরগোড়া থেকে। তারপর সেদিন আমায় জিওমেট্রি আর এরিথমেটিক পড়াবার নূতন নিয়ম শেখাতে এসেছিল। কি উদ্ভট খেয়াল ওর মাথায়! ললিতবাবুকে ও-নাকি বলেছে যে, যদি ২৫৩৬ দিয়ে কোন সংখ্যাকে গুণ করতে হয়, তবে আমরা যেমন করি, তেমন না করে প্রথমে ২০০০, তার পর ৫০০, তার পর ৩০, তার পর ৬ দিয়ে গুণ করতে হবে। চুলোয় যাক গে, ওর ক্ষেপামী নিয়ে ও থাক। আমাদের যে জ্বালাতন করে মারলে।"

বলা বাহুল্য, সেকেণ্ড মাষ্টার মশায় জানতেন না যে, রবীন মাষ্টার যে সব কথা বলেছিল সেগুলো গণিত-শিক্ষার আধুনিক পদ্ধতির কথা. বিলেতে অনেক পরীক্ষা করে সে সব গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি এগুলো সব রবীন মাষ্টারের উদ্ভট খেয়াল বলেই ধরে নিয়েছেন।

হেডমাষ্টার শুনে বললেন, "তাই না-কি? আচ্ছা, আমি ওকে ধম্‌কে দিচ্ছি।"

রবীন মাষ্টারকে ডেকে পাঠান হল। সেকেণ্ড মাষ্টার চলে গেলেন।

রবীন মাষ্টার আসতে হেডমাষ্টার বাবু তাঁকে বললেন, "এসব কি শুনছি রবীনবাবু, আপনি সব টিচারের কাজে খামকা হস্তক্ষেপ করছেন? 'আপনার চরকায় তেল দেবার' একটা কথা আছে জানেন তো?"

রবীন মাষ্টার অবাক হয়ে বললে, "কই না, আমি কার কাজে হস্তক্ষেপ করেছি?"

"করেন নি? সবাই তো বলছে, আপনি তাদের পড়াবার সময় গিয়ে জ্বালাতন করেন, তাদের পড়ান-সম্বন্ধে সব খামখেয়ালী উপদেশ দিতে যান। আপনি ভুলে যাবেন না যে, স্কুলটা পাগলা-গারদ নয়।"

অপমানে কান পর্য্যন্ত লাল হয়ে গেল রবীন মাষ্টারের। কিছুক্ষণ সে কোনও কথাই বলতে পারলে না। তারপর নিজেকে শান্ত করে সে বললে, "দেখুন, জ্বালাতন, হস্তক্ষেপ সব মিথ্যে। আমি ক্লাশের বাইরে ওঁদের সঙ্গে পড়াবার পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছি—ক্লাশের ভিতরে কিছুই বলি নি। কেবল সেকেণ্ড মাষ্টার সেদিন ক্লাশে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন আর ছেলেরা গোলমাল করছিল, তাই বাইরে ডেকে খুব নরম ভাবে তাঁকে ও-রকম করতে বারণ করেছিলাম।"

"তাই বা আপনি করতে যান কেন? সে দেখতে হয় আমি দেখব, আপনার তা কাজ নয়। আপনি সেকেণ্ড মাষ্টারের কাজের উপর সর্দ্দারি করতে যান কোন্ অধিকারে?"—গর্জ্জন করে হেডমাষ্টার এই কথা বললেন।

রবীন মাষ্টার খাড়া জবাব দিলে, "অধিকার আমার আছে বই কি।

আপনারা আমাকে অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেডমাষ্টার নিযুক্ত করেছেন স্কুলের শিক্ষা পরিদর্শন করবার জন্য। সে কথাটা ভুলে যাবেন না।"

হো হো করে হেডমাষ্টার এমন ভাবে হেসে উঠলেন যাতে ভারী অপমান বোধ হল রবীন মাষ্টারের।

হাসি থামলে হেডমাষ্টার বললেন, "তাই না-কি? অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেডমাষ্টার! নিয়োগ-পত্র আছে আপনার কাছে?"

"নিয়োগ-পত্র! নিয়োগ-পত্র আবার কিসের? আপনি মুখে বলে দিয়েছেন।"

হেডমাষ্টার আবার উগ্রস্বরে বললেন, "আমি বলেছি? নন্‌সেন্স! আপনি পাগল বলে আমি তো পাগল হই নি যে, আপনাকে এই ভার দিতে যাব।"

ক্রোধে রবীনের সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল।

শান্ত হলে সে বললে, "মিথ্যে বলছি আমি? আপনি নিযুক্ত করেন নি আমাকে অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেডমাষ্টার?—তাই বলে আমার কাছে মাইনে-বৃদ্ধি মাপ দিতে চিঠি লিখিয়ে নেন নি?"

"মাইনের সম্বন্ধে আপনি যে চিঠি দিয়েছেন, তার 'কপি' তো এখানেই আছে—দেখুন, এতে আপনি যে অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেডমাষ্টার এমন কোনও কথা আছে কি?"

আর কথা কইতে রবীনের ঘৃণা বোধ হল। সে বললে, "বেশ, তবে তাই।"

বুক তার ফেটে যেতে লাগল লজ্জায়, অপমানে, ঘৃণায়।

হেডমাষ্টার রবীনকে স্তোক দিয়ে চিঠিখানা আদায় করেছিলেন, আর তার পরদিনই লোক পাঠিয়ে তার দেওয়া বইগুলো আনিয়ে নিয়েছিলেন এবং কমিটির পক্ষ থেকে রবীনবাবুকে শুধু তাঁর চিঠি আর

বইয়ের জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে পত্র লিখেছিলেন। রবীন মাষ্টারের চিঠিখানা ইনস্পেক্টর অফিসে পাঠান হয়েছিল, কাজও হয়েছিল তাতে। সে-চিঠি পাবার পর ইনস্পেক্টর একবার স্কুল দেখে গিয়ে সরকারী সাহায্যের টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। তারপর ছ'মাস চলে গেছে।

অ্যাসিষ্টাণ্ট হেডমাষ্টার নিয়োগের কথা এবং স্কুলের শিক্ষা-পরিদর্শনের ভার দেবার কথা হেডমাষ্টার বলেছিলেন শুধু ঐ চিঠিখানা আদায় করবার জন্যে। তারপর সে-সম্বন্ধে আর কোন কথাই ওঠে নি। কমিটিতেও সে-কথা উল্লেখ করবার কোন দরকার হয় নি। রবীন মাষ্টার স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি যে, এ-কথা আবার ওল্‌টাতে পারে, আর কোনও একটা পাকা লেখা-পড়ার যে দরকার, তাও সে বিবেচনা করে নি। হেডমাষ্টারের কথায় নির্ভর করে সে ধরে নিয়েছিল, সে অ্যাসিষ্টাণ্ট হেডমাষ্টার হয়ে গেছে।

ভদ্রলোক এম-এ পাশ। সে যে এমন নির্জ্জলা মিথ্যে বলতে পারে, রবীন মাষ্টার ভাবতেও পারত না। এতক্ষণে সে বুঝতে পারল যে, ঐ অ্যাসিষ্টাণ্ট হেডমাষ্টারীর কথাটা মিথ্যা ভাঁওতা। শুধু তাকে বঞ্চনা করে সে ঐ চিঠি আদায় করে নিয়েছে! ওঃ! এত বড় ছোট লোক, জোচ্চর ঐ লোকটা, ছিঃ।

ঘৃণায়, ক্রোধে তার অন্তর ভরে গেল। গট্‌-গট্‌ করে বাড়ী চলে গেল স্কুল ছুটি হবার আগেই।

কোনও দিন সে কারও অনিষ্ট চিন্তা করে নি। অপমানে নিজের মনকে পীড়া দেওয়া ছাড়া কোনও দিন আর কিছুই তার হয় নি। কিন্তু আজ আর সইল না। রক্ত ফুটতে লাগল টগ্‌ বগ্‌ করে— এর একটা প্রতিকার করতেই হবে।

ভাবলে ব্ল্যাক সাহেবকে সে একখানা চিঠি লিখবে। কিন্তু লিখতে তার দারুণ লজ্জা বোধ হল। ব্ল্যাক সাহেব তার এত বড় হিতৈষী যে, এ-প্রদেশ ছেড়ে গিয়েও তার জন্যে এতখানি করেছিল। সে সুযোগ সে এমনি বোকামি করে হারিয়েছে, এই কথাটা ব্ল্যাক সাহেবকে জানাতে সে লজ্জায় যেন মরে গেল। তাই তার আর চিঠি লেখা হল না।

এর পর সে ভাবতে লাগল, দোষ তো কারও নয়, দোষ তার নিজেরই। সে নিজে এত বড় বেকুব কেন হল যে, হেডমাষ্টারের দু'টো মুখের কথায় নিজের স্বার্থ এমনি করে ছেড়ে দিতে গেল। এ ডাহা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। মূর্খেরা এমনি শাস্তি চিরদিনই পেয়ে এসেছে, পাবেও চিরদিন। এ আর নতুন কথা কি?

তার সমস্ত জীবনটা আলোচনা করে সে এখন দেখতে পেলে পদে পদে তার মূর্খতা। অদৃষ্টকে এতদিন নিন্দা করে এসেছে সে, অনুযোগ করেছে অদৃষ্টের এই নির্ম্মম নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে। কিন্তু ভেবে দেখলে, অদৃষ্ট তো তার হাতের গোড়ায় এনে দিয়েছিল অনেক সুযোগ। বুদ্ধির ভুলে সে-সুযোগ সে হারিয়েছে!

জীবনে একটি বস্তুকে সে কোনও দিন ভাবে নি, কোনও দিন তার কর্ম্ম-তালিকায় তাকে স্থান দেয় নি—সে স্বার্থ। যখন যা সে করেছে বা সঙ্কল্প করেছে, তাতে তার মনের ইচ্ছা চিরদিনই থেকেছে—সমাজের উপকার করা। পৃথিবীর দিকে সে আজ নতুন চোখ দিয়ে চেয়ে দেখলে—দেখলে পৃথিবীতে তার মত লোকের বড় হবার কোন সুযোগ নেই। এতদিন সে দার্শনিকদের শ্রদ্ধা করে এসেছে, তাদের মত এই যে, সমাজের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি নিছক মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থ-বুদ্ধি দিয়ে হয় না। সে স্বার্থ-বুদ্ধিকে সমাজের মঙ্গল দিয়ে নিয়ন্ত্রিত

করে নিতে হয়। আজ তার মনে হল, সে সব ভুল, সে তার নিজের ছোট্ট দুনিয়ার চারিদিকে চেয়ে দেখলে। জীবনে সফলতা লাভ করেছে কারা? যারা স্বার্থ ছাড়া অন্য চিন্তা মনে স্থান দেয় নি কোন দিন। আর সমাজের কল্যাণ? পরিমাণ হিসাব করলে দেখা যাবে, হয়ত তারাই করে উঠতে পেরেছে বেশী। তার গাঁয়ের মঙ্গলের জন্যে সে ভেবেছে সব চেয়ে বেশী। তার মাথায় এসেছে রাশি রাশি সঙ্কল্প, যার সিকি পরিমাণ কাজে পরিণত হলে গ্রামের চেহারা ফিরে যেত। কিন্তু সে শুধু ভেবেই গেছে আর ছট-ফটিয়ে মরেছে। কিন্তু যারা শুধু স্বার্থের কথা ভেবেছে, তারা যতখানি উপকার করেছে, তাও করবার সাধ্য হয়নি রবীনের। সতীশ চৌধুরী একটা চমৎকার পুকুর কাটিয়েছে—তার বাগানের শোভা আর জল-সেচের জন্যে, কিন্তু গাঁয়ের লোক আজ তার জল খেয়ে বাঁচছে। আগে চৈত্র-বৈশাখে জলের জন্যে হাহাকার লেগে যেত। ভুবন বাবু করলেন প্রায়শ্চিত্ত। নিজের আধ্যাত্মিক স্বার্থের জন্য তুলাদান হল। গ্রামের অনেক গরীব-দুঃখী তাতে বেঁচে গেল। রবীনের ছাত্র ইয়াসিন স্বার্থপরের শিরোমণি। কেবল ধাপ্পা দিয়ে মুসলমান চাষীদের মাথায় হাত বুলিয়ে টাকা রোজগার করা তার ব্যবসা। সে-ও নিজের লাভের চেষ্টায় করলে এক মক্তব। অনেক চাষীর ছেলে তাতে তবু সেই ধর্ম্মের গন্ধে পড়তে যাচ্ছে—যা হয়ত তারা করতই না এ ছাড়া।

আর রবীন শুধু তার বড় বড় আইডিয়া নিয়ে ধড়-ফড়ানি ছাড়া কি-ই-বা করেছে কার? রাশি রাশি বই পড়েছে সে, কার কি উপকার হয়েছে তাতে? অনেক শুভ-ইচ্ছা আছে তার। দরিদ্রের মনোরথ সে সব—মনের ভিতরই মিলিয়ে গেছে, কোনও উপকারই কারও হয়নি তাতে। করেছে সে স্কুল, তা-ও সবাই প্রায় ভুলে গেছে সে কথা।

কেবল সে ভোলে নি। কিন্তু তাই বা সে করেছে কতটুকু? আর সেই স্কুল যেমন ভাবে চলছে তাতে উপকার হচ্ছে, কি অপকার হচ্ছে, কে জানে? যদি এই স্কুল আর এমনি সব বাজে স্কুল না গজাত, তবে হয়ত এ ছেলেগুলো অন্য কোথাও ভাল স্কুলে লেখা-পড়া শিখত, মানুষ হত। এই সব সস্তা দোকানদারীর স্কুল করে সত্যি সত্যিই ভাল স্কুল হওয়া বা চলা অসম্ভব হয়েছে।

ভুল, ভুল সব—সারা জীবনটাই তার ভুলের ভিতর দিয়ে কেটে গেছে। এখন আর সে-ভুল শোধরাবার উপায় নেই। বাহান্ন বছর বয়স তার, আর কটা দিনই বা আছে? এর ভিতর কি-ই-বা সে করতে পারবে? আর করবার শক্তিই বা কোথায়? না শরীরে, না মনে আছে তার সেই যৌবনের শক্তি, যা নিয়ে হাজার বাধা অতিক্রম করে, সে এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথাটা এই যে, তার মনে সে-উৎসাহের নিশ্বাসটুকুও আর নেই, যাতে বাহুতে শক্তি হয়, মনে উদ্দীপনা আসে, অসাধ্যও সাধনীয় হয়ে ওঠে।

হতাশ হয়ে রবীন মাষ্টার শুয়ে পড়ল তার বইয়ের পাঁজার ভিতর।

শুয়ে শুয়ে তার মনে হল, এই সব বই সে পড়েছে, তন্ন তন্ন করে পড়েছে, ঠাস বোঝাই করেছে এর সব বিদ্যা তার মাথায়। কি লাভ হয়েছে তাতে? কার কি উপকার হয়েছে? তার নিজের হয় নি। কেন না যতই সে পণ্ডিত হয়ে থাক, সেই বি-এ ফেলের ছাপ দিয়েই রয়ে গেল তার সংসারে পরিচয়। আর বাইরের লোক? তাদের কাছে এ বিদ্যে পৌছবার সুযোগই তো হল না কোন দিন। সে শুধু পড়িয়ে গেল সেই ছাপমারা ছক-কাটা হিষ্টরী-হাইজিন!

দু'দিন বাদে হক, দশ দিন বাদে হক, তার এত কষ্টের অর্জ্জিত এই বিদ্যা ধোঁয়া হয়ে উড়ে যাবে তার চিতা থেকে। এমন নয় যে,

তার ছেলে এ বিত্তা বাঁচিয়ে রাখবে। সে আশা তার নেই, আর সে ইচ্ছাও তার নেই। সে চায় না যে, তার ছেলেদের কেউ তার মত এমনিই নিরর্থক বিত্তার বোঝা মাথায় বয়ে তারই মত অপদার্থ হয়ে দুঃখের জীবন কাটায়। বরং রণু যা করতে চায়—চাষ-বাস, তাই তারা করুক, সেও ভাল।

আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে তার বিত্তা—যেমন আগুনে পুড়ে ছাই হবে এই মুহূর্ত্তে এই বইয়ের পাঁজা, যদি দেশলাই জ্বালিয়ে সে এর ভিতর ফেলে দেয়।

দেশলাই-জ্বালার কথাটা মনে হতেই তার চোখ বসে গেল বইয়ের উপর। একটা উগ্র আকাঙ্ক্ষা হল দেশলাইটা জ্বেলে একবার বইয়ের মধ্যে ফেলে দিতে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে সবগুলো বই—জ্বলে উঠবে তার এই সাধনার গৃহ—আর সঙ্গে সঙ্গে ছাই হয়ে যাবে সে নিজে তার সব অনাবশ্যক বিত্তা নিয়ে! কেন যাবে না?

উঠল সে, তুলে নিলে দেশলাই, জ্বাললে একটা কাটি, ফেলে দিলে বাইরে। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা—কাটি জ্বালতেই লাগল সে আর ফেলে দিতে লাগল সম্পূর্ণ অন্যমনস্কভাবে। আর ভাবতে লাগল, সে যখন এমনি করে তার বইগুলো নিয়ে পুড়ে মরবে, তখন গাঁয়ের লোক কি বলবে? কেউ একবারও আহা বলবে কি? বয়ে গেছে তাদের। কার কি লোকসান হবে যে, তারা ভাববে তার কথা?

নিস্তারিণী? ছেলেরা? দুঃখ পাবে তারা, কিন্তু সে বেশী কিছু নয়। ছেলের জন্যে বাপ যত ভাবে, যত তার দরদ, বাপের জন্যে ছেলের তা হয় না। দুদিন যেতেই সয়ে যাবে সব। তার মনে হল, কত লোকের বাপ মরেছে, ঘটা করে শ্রাদ্ধ করে ছেলেরা দুদিন না-যেতে-যেতেই ফুর্ত্তি করতে লেগে যায়। ভুবনবাবু আজ যদি মারা যান, যোগেশ তো কাল

নাচতে থাকবে। তা ছাড়া সে বেঁচে থেকে তার ছেলেদের কি-ই-বা করতে পারছে যাতে তারা তার অভাব মনে করবে বা ক্ষতি-বোধ করবে?

কিচ্ছু না। কারো প্রাণে লাগবে না সে মরলে কেবল একজন ছাড়া—সে তড়িৎ। তার জীবনের দুঃখের পরিচয় পেয়ে এ বিশাল জগতের ভিতর একমাত্র তড়িৎই কেঁদেছিল, আত্মহারা হয়ে কেঁদেছিল। যদি সে শুনতে পায় যে, রবীন এমনি করে পুড়ে মরেছে, বড় দুঃখ পাবে।

তারপর সে যখন আবার নতুন করে তার জীবনের কথা ভাবলে, তখন তার মনে হল, এতে হতাশ হবার কোন হেতু নেই। এখনও তো আছে কিছুদিন তার কাজ করবার। হয়ত আরও দশ বছর কি বিশ বছর সে বাঁচবে। এর ভিতর কত কাজই তো সে করতে পারে। এই গ্রামখানিই তো বিশ্ব নয়। নাই-বা হল তার আদর এখানে, বাইরে আছে সুধী সমাজ, সেখানে সে সমাদর পাবেই। তার মনে হল তড়িৎ ও তার স্বামীর কথা—পণ্ডিত তারা। তাদের কাছে তার বিদ্যার সমাদর হয়েছে। তড়িৎ না হয় ভালবাসে বলে তাকে এত আদর করেছে, কিন্তু তার স্বামী? আর ব্ল্যাক সাহেব? তারা তো কেউ নয় তার, তবু তারা তার পাণ্ডিত্যের সমাদর করেছে। একবার যদি রবীন তার এই গ্রামের গণ্ডি ছাড়িয়ে বাইরে সুধী-সমাজে তার বিদ্যার পরিচয় দিতে পারে, তবে তার জীবন বা বিদ্যা অসার্থক হবে না।

তাই সে স্থির করলে—থাক পড়ে তার গ্রাম, তাকে তোলা থাক তার গ্রামের হিত-চিন্তা, বিশ্বের সেবায় সে নিযুক্ত করবে তার বিদ্যা। এতদিন পড়ে পড়ে ভেবে চিন্তে যে বিদ্যা সে সংগ্রহ করেছে, তা সে একখানা বই লিখে চিরকালের জন্য রেখে যাবে। সে মরে যাবে, কিন্তু তখনও সে-বই থাকবে, তার ভিতর দিয়ে তার এতদিনের সমস্ত সাধনা সার্থক হবে হয়ত কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে।

এই সিদ্ধান্ত করে সে তক্ষুণি টেনে নিলে তার নোট লেখার একখানা খাতা। তার অর্দ্ধেক পাতা তখনও সাদা ছিল। সেই পাতাগুলো বের করে সে লিখে যেতে লাগল তার কল্পিত মহা-গ্রন্থের বিষয়ের একটা সংক্ষিপ্তসার।

ভেবে-চিন্তে খাতার উপর সে বইখানার নাম লিখলে, "বঙ্গদেশের অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক পুনঃসংস্কার।" তার পরিচ্ছেদগুলি সে মোটা-মুটি ভাগ করলে। তারপর দু'মাস খেটে সে প্রত্যেক পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তুর মোটামুটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখে গেল।

## ১৩

রবীন মাষ্টার ভুবনবাবুর ব্যারামের খবর পেয়ে বেরিয়ে এসেছে তার পাঠাগার থেকে।

যোগেশের ঘরে ঢুকে সে হাসির কলরোল শুনতে পেল। হেডমাষ্টারের সঙ্গে বসে যোগেশ হাসি মস্করা করছে। অবাক হয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, "কর্তা কেমন আছেন, যোগেশ?"

"একই রকম। জ্বর লেগেই আছে, আর বেশীর ভাগ সময়ই ঘুমের ঘোরে থাকেন।"

তার মাঝখানে যোগেশের এই অট্টহাস্য!

রবীন মাষ্টার বসে পড়ল। মনে মনে হাসলে, ভাবলে, না হবে কেন? এই তো হচ্ছে দুনিয়ায় দিন-রাত!

কোঁচা দিয়ে কপালের ঘাম মুছে সে আবার জিজ্ঞেস করলে, "ক'দিন ধরে এমন চলছে?"

"দশ দিন হল অসুখ হয়েছে, এমনভাবে চলছে আজ তিন দিন।"

আজ দশ দিন ভুবনবাবু শয্যাগত। গ্রামের ডাক্তার কবিরাজ অনবরত হাজির আছে। সবাই আশঙ্কা করছে, এবার বুঝি তার আর রক্ষা নাই।

ব্যস্ত হয়ে রবীন বললে, "বাইরে থেকে একজন বড় ডাক্তার এনে দেখাও না।"

"সে কথা বলেছিলাম ওঁকে, উনি কিছুতেই আনতে দেবেন না। বলেন, মিথ্যে টাকা খরচ—"

উত্তেজিত ভাবে রবীন বললে, "উনি বলতে পারেন সে কথা কিন্তু তোমার তা শোনা উচিত নয়!"

বলে কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে বসে রইল। শেষে ফিক্ করে হেসে বললে, "তা ঠিক করেছ—বিষয়টা!"—বলে সে উঠে চলে গেল।

কথাটা শুনে যোগেশের ভারী রাগ হল। রবীন মাষ্টারের কথার অর্থ সে ঠিকই বুঝলে। তাড়াতাড়ি বিষয়ের মালিক হবার জন্যে যোগেশ বাপের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করছে না, এই ইঙ্গিত করে গেল রবীন মাষ্টার। সে গুম্ হয়ে মুখ লাল করে বসে রইল।

রবীন মাষ্টার চলে যেতেই হেডমাষ্টার হেসে বললে, "একেবারে পাগল হয়ে গেছে। ক্ষণে রাগ, ক্ষণে হাসি। ঘটে যদি এক ফোঁটা বুদ্ধি অবশিষ্ট থাকত! তবে কি ও হাসে এ কথায়—আর এই সময়ে!"

তিনি নিজে যে কেবলি হাসছেন সেই থেকে, সেটা তাঁর মাথায় এল না।

যোগেশ কথাটা শুনে একটু হাসল। বিচলিতভাবে বিদায় নিয়ে সে ভিতরে চলে গেল। তার একটু পরেই লোক গেল সহরের বড় ডাক্তারকে টেলিগ্রাম করতে।

দু'দিন বাদে ভুবনবাবু মারা গেলেন। রবীন মাষ্টারের লেখা-পড়া বন্ধ রইল। বার বার সে ব্যস্ত হয়ে জমিদার বাড়ী ছুটাছুটি করতে লাগল।

যোগেশ তাকে দেখতে পেলেই হয় পাশ কাটিয়ে যায়, না হয় মাথা নীচু করে চোখের জল ফেলে।

ভুবনবাবুর শবদেহ খুব ঘটা করে সাজিয়ে সংকীর্ত্তন করতে করতে সবাই শ্মশানে নিয়ে গেল।

রবীন মাষ্টার রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে শবযাত্রা দেখতে দেখতে একবার হঠাৎ এমন হেসে উঠল যে, যারা তার হাসি দেখল, তারা অনেকে চটে গেল। কিন্তু যোগেশ যেন মরে গেল লজ্জায়।

রবীন মাষ্টার ভাবছিল, পয়সা খরচের ভয়ে চিকিৎসা হল না ভুবনবাবুর, আর তাঁকে সৎকার করবার জন্মে আড়ম্বর কত! ভাবছিল, কি বোকামী মানুষের! মড়াটা—সে শুধু মড়াই, ইট-কাঠের সামিল, তবু তাকে নিয়ে কি আড়ম্বর! ভাবছিল, চোখ বুঝলেই যেখানে সব শেষ, সেখানে মানুষ জীবন ভরে এত ছট্‌ফটায় কেন? মারামারি কাটাকাটি করে কেন? দু'টো টাকার জন্মে ছেলে বাপের মৃত্যু কামনা করে কেন? বিষম বুজ্‌রুকি এ দুনিয়া। ভাবতে হাসি পায়!

মনটা এই সব চিন্তায় এত ভরে গিয়েছিল তার যে, সে এর সবটাই নিজের মনের ভিতর আটকে রাখতে পারলে না।

একজন বলছিল, "ভুবনবাবু অত বড় লোক—তাঁকে শ্মশানে নিয়ে যাবে—এমনি নাহলে কি মানায়!"

রবীন মাষ্টার বললে, "কে ভুবনবাবু? ঐ মড়াটা? ক্ষেপেছ? দাবা খেলতে পারে ও?"

সে লোকটা অবাক হয়ে রবীন মাষ্টারের দিকে চাইলে, কিন্তু কিছু বললে না, ভাবলে, 'পাগল ও, ওর কথা শোনে কে?'

রবীন বললে, "আচ্ছা আমি যদি বলি, তোমায় এর চেয়ে দশগুণ ঘটা করে নিয়ে পোড়াব, তবে তুমি মরতে রাজী আছ?"

লোকটা সরে দাঁড়াল, সে ভাবলে, ভুবনবাবুর শোকে রবীন মাষ্টারের বুদ্ধি-সুদ্ধি যা ছিল, তাও গেছে। ওর কাছে থাকা নিরাপদ নয়, চাই কি এক্ষুণি হয়ত তাকে মেরে খাটিয়ায় চড়িয়ে দিয়ে সমারোহ করে ঘাটে নিয়ে যেতে চাইবে।

নায়েব মশায়কে ডেকে সে জিজ্ঞেস করলে, "ভুবনবাবুর সৎকার থেকে শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত খরচের বরাদ্দ হয়েছে কত?"

সদর নায়েব বললে, "বরাদ্দ কিছুই হয় নি, কিন্তু খরচ হবে হয়ত হাজার দশেক টাকা।"

রবীন মনে মনে হিসাব করে বললে, "জোর হাজার টাকা খরচ করলে চিকিৎসা হত! কিন্তু, হ্যাঁ—বিষয়টা!"

সদর নায়েব কিছুক্ষণ হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে থেকে সরে দাঁড়াল। ভাবলে সে, পাগলা মাষ্টার একদম ক্ষেপে গেছে!

* * * *

কয়েকদিন পরে ভুবনবাবুর বাক্স-পেটরা ঘাঁটতে ঘাঁটতে যোগেশ এক উইল দেখে চমকে উঠল। কাউকে কিছু না বলে সে উইলখানা নিয়ে নিজের ঘরে বসে পড়লে।

যোগেশরা তিন ভাই। যোগেশ শুধু সাবালক, আর দু'টি নাবালক। তার মা অনেকদিন গত হয়েছেন, বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে।

উইলে ভুবনবাবু যোগেশকে দিয়ে গেছেন সম্পত্তির আট আনা, আর দু'ভাইকে দিয়ে গেছেন চার আনা চার আনা করে।

শুধু এইটুকু থাকলে যোগেশ আনন্দে নাচত। কিন্তু উইলে আরও যে কথা ছিল, তাতে সে ভড়কে গেল।

উইলে ভুবনবাবু বিধান করেছেন যে, তাঁর ঠাকুরের যে দেবোত্তর সম্পত্তি তিনি করেছেন, তার উপস্বত্ব থেকে বছরে পাঁচ শত টাকা গ্রামবাসীর শিক্ষা বা অন্যান্য হিতসাধনের জন্য খরচ হবে। সে টাকাটা প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে রবীন মাষ্টারকে দিতে হবে। তিনি তাঁর ইচ্ছামত এই সবের মধ্যে যে-কোনও হিতকর-কার্য্যে খরচ করতে পারবেন।

এর চেয়েও মারাত্মক কথা এই যে, উইলের একমাত্র এক্‌জিকিউটার করা হয়েছে রবীন মাষ্টারকে। সব ক'টী ছেলে সাবালক না হওয়া পর্য্যন্ত উইল অনুসারে কাজ করবে সে।

উইলখানা রেজেষ্ট্রি করা হয় নি। ভুবনবাবু এটা করেছিলেন দশ-বারো বছর আগে। এর সাক্ষীর ভিতর রাধানাথবাবু আছেন বিদেশে, আর দু'জন সাক্ষী মারা গেছেন; আর কেউ এর খোঁজ জানেন না। সুতরাং এটা চাপা দেওয়া সম্ভব। কিন্তু ঐ যে আট আনা সম্পত্তি, যোগেশের তা'হলে সেটা হয়ে যায় পাঁচ আনা ছ'গণ্ডা দু'কড়া দু'ক্রান্তি।

বিষম ফাঁপরে পড়ে গেল যোগেশ। কি করবে কিছুই ভেবে উঠতে পারল না। কারও সঙ্গে পরামর্শ করতেও তার সাহস হল না। চুপচাপ সে উইলখানা সিন্দুকে বন্ধ করে রেখে দিলে।

তারপর শ্রাদ্ধ-শান্তি সব হয়ে গেলে পিতার অস্থি গঙ্গায় দেবার উপলক্ষ্য করে যোগেশ গেল কলকাতায়। সেখানে খুব বড় একজন উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করলে। উকীলবাবু তাকে উপদেশ দিলেন, উইলখানা থাকুক তোলা। ভাইয়েরা বড় না হওয়া পর্য্যন্ত সম্পত্তি তো

যোগেশের হাতেই থাকবে, সুতরাং সে-পর্য্যন্ত প্রোবেট নেবার কোনও দরকার নেই। এর ভিতর রবীন মাষ্টার বোধ হয় মারা যাবে, তার পর প্রোবেট নিলে কোনও হাঙ্গামা থাকবে না।

যোগেশ নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী ফিরে গেল।

এর পর একদিন রবীন মাষ্টার তাকে হঠাৎ বললে, "হাঁ হে যোগেশ, তোমার বাবার কোনও উইল-টুইল…"

যোগেশের বুকটা কেঁপে উঠল। সে শুষ্কমুখে বললে, "না।"

রবীন মাষ্টার বললে, "ভারী আশ্চর্য্য কিন্তু!"

যোগেশের বুকের ভিতর দুড়্‌দুড়্‌ করে উঠল। তবে কি রবীন মাষ্টার সব জানে? সে কি জানে যে, সে-ই এক্‌জিকিউটার, আর তাকে পাঁচ-শো টাকা দিতে হবে বছরে? তার প্রাণ কেঁপে উঠল। বড় ভয়ে ভয়েই সে দিন কাটাতে লাগল, আর প্রতিদিন রবীনের মৃত্যু-কামনা করতে লাগল।

অভাগা রবীন মাষ্টার! এমনি করেই চিরদিন সৌভাগ্য তার দোর গড়ায় এসে ফিরে গেছে। ওই পাঁচ-শো টাকা করে যদি সে আজ হাতে পেত, তবে তার জীবনের গতি যেত ফিরে, নতুন উৎসাহে সে লেগে যেত গ্রামের হিত-সাধনের চেষ্টায়। তার জীবনের একটা অর্থ হত।

সেটা হল না। তাই সে প্রাণপণে তার বই লিখতে লাগল।

## ১৪

অনেক কাটাকুটি যোগবিয়োগ করে রবীনের বইয়ের সংক্ষিপ্তসার শেষ হল। তার পর সে লিখতে আরম্ভ করলে বইখানা। একটা

পরিচ্ছেদ শেষ করে ভালই লাগল তার। মনে হল একবার কোনও সমঝদার লোক পেলে তাকে শুনিয়ে নিলে সুবিধা হত। ব্ল্যাক সাহেব কিম্বা তড়িৎ যদি থাকত!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ লেখার সময় একদিন সে একটা 'তার' পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

সুকেশ লিখেছে, "তড়িৎ মৃত্যু-শয্যায়, রবীনকে একবার দেখতে চায়।" 'তার' করে টাকা পাঠিয়ে সুকেশ তাকে অবিলম্বে দিল্লী যেতে বলেছে।

আড়ষ্ট হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল রবীন। তারপর তাড়াহুড়ো করে তখনই বেরিয়ে পড়ল দিল্লী যাবে বলে। স্কুলে ছুটি নেবার কথাও তার মনে হল না। নিস্তারিণীকে জানাবার প্রয়োজনও সে বোধ করল না।

উদ্বেগের বোঝা মাথায় নিয়ে এই দীর্ঘ পথ যে কোথা দিয়ে কেমন করে গেল, সে কথা সে খেয়ালই করল না।

চার দিনে সে পৌছল দিল্লী।

সুকেশের অফিসের এক চাপরাসী ষ্টেশন থেকে তাকে নিয়ে বাড়ী গেল। সেখানে পৌছতেই সুকেশ নেমে এসে সাশ্রু-নয়নে তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল একটা ঘরে।

সেখানে তড়িৎ চিরনিদ্রায় শুয়ে ছিল।

আজ প্রত্যুষে তার শেষ নিশ্বাস পড়ে গেছে।

বেত্রাহতবৎ চমকিত হয়ে রবীন চাইলে সুকেশের দিকে। সুকেশ শুধু ইঙ্গিতে জানালে, সব শেষ হয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ পরে সে উঠে সন্তর্পণে পা ফেলে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল তড়িতের সেই মৃত্যু-শয্যার পাশে—যেন পদশব্দে ঘুম ভেঙে যাবে তড়িতের।

একটা নিদারুণ হাহাকারে আর্ত্তনাদ করে উঠল তার চিত্ত। সে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

সৎকার শেষ করে যখন ফিরে এল তারা, তখন স্থকেশ তার কাছে বললে তড়িতের অস্থখের কাহিনী।

কয়েক মাস হল তার অস্থখ হয়। কিছুদিন হল ডাক্তারেরা আবিষ্কার করলেন যে, তার পেটের ভিতর ক্যানসার হয়েছে। সেইদিন সবাইয়ের সঙ্গে তড়িৎও জানল যে, মৃত্যু তার নিশ্চয়—শুধু জানল না কেউ, কবে সে-মৃত্যু আসবে। সবারই আশা ছিল বিলম্ব আছে।

দিল্লীতে থাকতে রবীনের দম ফেটে যেতে লাগল। তড়িতের শত স্মৃতি-চিহ্ন তার চারিদিক থেকে তাকে যেন বৃশ্চিকের মত কামড়াতে লাগল। যে কলেজে তড়িৎ পড়াত, লাইব্রেরীতে যেখানে বসে সে পড়ত, যেখানে সে বেড়াতে ভালবাসত—সব স্থকেশ তাকে দেখালে। দেখে দেখে রবীনের চোখ জ্বলে যেতে লাগল।

দু'দিন বাদে সে বললে, "আমায় এখন বিদায় দিন স্থকেশবাবু।"

উদাস হতাশ হৃদয়ে রবীন মাষ্টার ফিরে এল।

বাড়ী ফিরে সে তার বসবার ঘরে গিয়ে শুয়ে রইল। মনের ভিতর আগুন জ্বলছিল তার। চোখ দু'টো মরুভূমির মত শুক্‌নো জ্বালাময়।

রবীন মাষ্টার এসে বাইরের ঘরে পড়ে আছে শুনে নিস্তারিণীর পিত্ত জ্বলে গেল।

অনেক দিন আগেই সে স্বামীর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করেছিল, কিন্তু এখন সে চুপ করে আর সইতে পারলে না।

রবীন মাষ্টার যখন দিল্লী যায় তখন নিস্তারিণী ঘুমিয়ে ছিল। কাজেই

কিছুই জানতে পারে নি। পরে শুনতে পেলে যে, রবীন তল্পী-তল্পা নিয়ে চুপচাপ বেরিয়ে গেছে। তখনই তার চিত্ত অধীর হয়ে গেল ক্রোধে ক্ষোভে এবং দুশ্চিন্তায়।

এর পর সে ছেলে-পিলেদের অনর্থক মারধর করতে লাগল। সতীনকে একদিন ঝাঁটা-পেটা করলে, আর, তিন দিনের ভিতর গ্রামের সবার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে নিলে।

রবীন যে দিন গেল, সেই দিনই হেডমাষ্টার তার বাড়ীতে চাপরাসী পাঠিয়েছিলেন রবীনের খোঁজ নিতে। তারপর রোজ খোঁজ নিয়েছেন তিনি। তিন দিন পরে হেডমাষ্টার রবীনের নামে একখানা চিঠি পাঠিয়ে জানালেন যে, ছুটি না নিয়ে রবীন মাষ্টার কামাই করেছেন। তিনি যদি পরের দিন স্কুলে হাজির হয়ে তাঁর অনুপস্থিতির সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারেন, তবে তাঁকে ডিস্‌মিস্‌ করা হবে।

নিস্তারিণী চিঠিখানা পেয়ে একজনকে ডেকে সেটা পড়ালে। পত্রের মর্ম্ম শুনে একেবারে আগুন হয়ে উঠল সে। প্রথমে বাড়ীতে বসে গলা ফাটিয়ে খুব এক চোট গালি-গালাজ করলে অনুপস্থিত রবীনকে লক্ষ্য করে। তারপর বিকেলে সে মারমূর্ত্তি হয়ে ছুটল হেডমাষ্টারের বাড়ী।

হেডমাষ্টার স্ত্রীর সামনে বসে খাবার খাচ্ছিলেন। নিস্তারিণী এর আগে কখনো হেডমাষ্টারের সামনে বেরোয় নি। এবার সে একেবারে ঝড়ের মত তার সামনে এসে বললে, "হ্যাঁগা হেড-মাষ্টার বাবু, ভারী যে হেডমাষ্টারী-চাল চালতে এসেছ! আমার সোয়ামীকে না-কি ডিস্‌মিস্‌ করতে চাও?"

হেডমাষ্টার যে সন্দেশে কামড় দিতে যাচ্ছিলেন সেটা হাতে

ধরাই রইল। এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের দিকে হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন তিনি।

নিস্তারিণীর প্রশ্নের উত্তরে বিরক্ত হয়ে বললেন, "কাল তিনি এসে না পৌঁছলে ডিস্‌মিস্ করতেই হবে আমাকে—এই যে নিয়ম। না বলে, না কয়ে একদিন কামাই করলে চাকরী যায় জানেন?"

"কাল এসে পোঁছবে কোত্থেকে? সে হঠাৎ জরুরী 'তার' পেয়ে তক্ষুণি চলে গেছে সেই হাবড়া না কাশী।" (এ বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ তার নিজের উদ্ভাবনা-শক্তি-উদ্ভূত—সে তারের কথা বিন্দু-বিসর্গও জানে না) কাল এসে পোঁছবে কোত্থেকে?"

"তা কি করব? না এলে ডিস্‌মিস্ হবেন।"

"ঈস্! বড় আমার ডিস্‌মিস্ করনেওয়ালা রে! তুমি ডিস্‌মিস্ করবার কে হে? ও স্কুল কার? কে করেছে? সাতখানা গাঁয়ের লোক জানে যে, ও আমার সোয়ামীর স্কুল। সেখান থেকে তাকে ডিস্‌মিস্ করবার তুমি কে গো। কে তুমি? তোমায় এনে চাকরী দিলে কে? তাকে যে বড় ডিস্‌মিস্ করতে যাচ্ছ?"

হেডমাষ্টার এ কথায় রেগে উত্তর করলেন, "ভারী জ্বালাতন করলে দেখছি।"

আর কথা বলা হল না তাঁর। কুরুক্ষেত্র লেগে গেল। রবীন্দ্র-গৃহিণী লম্ফ-ঝম্ফ করে চীৎকারে গলা ফাটিয়ে হেডমাষ্টারের চতুর্দ্দশপুরুষ উৎসন্ন করে এমন গালি-গালাজ আরম্ভ করলে যে, তার কথার বন্যার ভিতর একটি কথা ঢোকায় কার সাধ্য?

দেখতে দেখতে অন্দরের উঠানে পাড়ার লোক জমে গেল। হেড-মাষ্টার বারবার তাঁর কণ্ঠ মুখর করবার ব্যর্থ প্রয়াস করে হাল ছেড়ে দিলেন। তাঁর অনুভব হল যে, বোধ হয় এতে তার অপমান হচ্ছে।

তিনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে একেবারে যোগেশের বৈঠকখানায় গিয়ে হাজির হলেন

নিস্তারিণী সংহার-মূর্ত্তিতে এমনি করে কয়েকদিন কাটাবার পর যখন শুনতে পেলে রবীন এসেও বাড়ীর ভিতর আসে নি—তখন সে উগ্রমূর্ত্তিতে ছুটে বাইরের ঘরে গিয়ে অবিলম্বে আদেশ করলে এক্ষুণি রবীন হেডমাষ্টারের কাছে গিয়ে হাতে পায়ে ধরুক, যাতে তিনি আবার চাকরীতে তাকে বহাল করেন।

রবীন যখন শুনলে হেডমাষ্টার তাকে ডিস্‌মিস্‌ করে চিঠি দিয়েছেন —তার চাকরী গেছে, তখন সে শুধু নির্লিপ্তভাবে বললে, "যাক্।"

"যাক্ মানে?"—নিস্তারিণী অবাক হয়ে গেল; বললে, "যাক্ মানে কি? চাকরী না করলে খাবে কি? দু'বেলা কার পিণ্ডি গিলবে?"

রবীন উঠে বসে তার মুখের দিকে চেয়ে শুধু বললে, "ওগো, তড়িৎ আর বেঁচে নেই।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে নিদারুণ আঘাত খেয়ে নিস্তারিণী চমকে উঠল। ব্যথিত কণ্ঠে বললে, "অ্যাঁ! তড়িৎ নেই!"

এমন একটা লজ্জায় অভিভূত হয়ে গেল যে, সে আর কিছুই বলতে পারলে না। একেবারে স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে গেল।

স্বামীর দিকে চেয়ে সে দেখতে পেল কি গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে আছে তার ঘুম। না জেনে-শুনে এমনি সময়ে সে রাগ করে ধেয়ে এসেছিল,—কি লজ্জার কথা!

খুব অপ্রস্তুত হয়ে মুখখানা ভার করে সে অনেকক্ষণ সেইখানে বসে রইল। তারপর বললে, "কি হয়েছিল তার?"

সংক্ষেপে রবীন বললে, "ক্যান্সার।"

"ও বাবা!"—বলে নিস্তারিণী আবার চুপ করে গেল। তারপর আবার সে বললে, "তুমি বুঝি ব্যারামের খবর পেয়ে ব্যস্ত হয়ে গিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"গিয়ে দেখতে পেয়েছিলে?"

রবীন শুধু ঘাড় নাড়লো।

নিস্তারিণী বললে, "আহা!"

চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়া জল সে মুছে ফেলল আঁচল দিয়ে। বললে, "তা কি আর করবে? ভগবানের মার! এ তো আর মানুষের হাত নয়। চল, এখন ভেতরে চল, মুখ-হাত ধোও, কিছু খাও।"

নিস্তারিণী জোর করে রবীনকে অন্দরে নিয়ে গেল। রবীন স্নানাহার করলে নিস্তারিণী বললে, "দেখ, চাকরীটা গেলে বড় কষ্ট হবে। যাবে একবার হেডমাষ্টারের কাছে?"

রবীন বললে, "না, আর যাব না। চাকরী করবই না আমি।"

কিন্তু রবীন মাষ্টারের চাকরী সত্যি সত্যি যায় নি। হেডমাষ্টার চিঠি দিয়েছিলেন—পরের দিন হাজির না হলে তার চাকরী যাবে। পরের দিন রবীন যখন হাজির হল না তখন তিনি খুব জোর করে কমিটির কাছে বললেন যে, এবার রবীনকে ডিস্‌মিস্‌ করতেই হবে। তাঁর খুবই ভরসা ছিল, এবার রবীনের চাকরী না গিয়ে যায় না। কেন না, রবীনের প্রধান মুরুব্বী ভুবনবাবু—যাঁর জন্যে এ পর্য্যন্ত তাকে তাড়ান

সম্ভব হয় নি, এখন নেই। সতীশ চৌধুরী একটু গোলমাল করতে পারতেন, তিনিও অসুস্থ হয়ে চেঞ্জে গেছেন, সুতরাং এবার আর রবীন ডিস্‌মিস্‌ না হয়ে যায় না।

কিন্তু হেডমাষ্টার দেখে অবাক্ হয়ে গেলেন—যোগেশ এ প্রস্তাবে এমন তীব্রভাবে আপত্তি করলে যে, ভুবনবাবুও তেমন কোন দিন করেন নি। বাকী মেম্বার যে কয়জন ছিলেন তাঁদের কারও শক্তি ছিল না যোগেশের মতের বিরুদ্ধে ভোট দেন।

হেডমাষ্টার ভেবে দিশাই পেলেন না যোগেশ হঠাৎ রবীন মাষ্টারের এত বড় ভক্ত হয়ে গেল কি করে! তিনি দেখে-শুনে আরও অবাক্ হয়ে গেলেন যে, রবীন মাষ্টার এসেছে খবর পেয়েই যোগেশ তার বাড়ী গিয়ে তার খবরা-খবর নিয়েছে এবং হেডমাষ্টার যে রবীনের অনুপস্থিতিতে তাকে ডিস্‌মিস্‌ করবার কথা জানিয়ে চিঠি লিখেছে, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এসেছে।

যোগেশকে রবীন মাষ্টার বললে, "না বাবা, আমি আর কাজ করব না। কাজ করবার শক্তি আমার নেই।"

যোগেশ কিছুতেই ছাড়ল না। সে বলল, "আপনার শক্তি না থাকে শুধু স্কুলে গিয়ে বসে থাকবেন, কোন কাজ করতে হবে না। আপনি বেঁচে থাকতে স্কুল ছাড়তে দেব না আমি কিছুতেই।"

যোগেশের মনে ভয় হয় যে, রবীন মাষ্টার হয়ত উইলের কথা সব জানে। যদি সে চটে তবে সে কি করবে কে জানে? তাই তাকে যথাবিধি তোয়াজ করে হাতে রাখা ছাড়া আর উপায় নেই।

সুতরাং প্রাণহীন শবের মত রবীন তার ভাঙ্গা দেহ টেনে স্কুলে যাওয়া-আসা করতে লাগল।

কয়েকদিন পর সে সুকেশের একখানা চিঠি পেল। সুকেশ

লিখেছে যে, তড়িতের ড্রয়ারে খুঁজে পাওয়া গেছে রবীনের নামে একখানা চিঠি। সেই চিঠি স্থকেশ রবীনকে পাঠিয়েছে।

তড়িতের চিঠিখানা পড়তে পড়তে তার ছ'চোখ জলে ভেসে গেল।

অস্থখের আট দশ দিন পরে তড়িৎ এ চিঠি লিখেছিল। আর তার স্বামীর নামেও আর একখানা চিঠি লিখে সে তার ড্রয়ারে বন্ধ করে গিয়েছিল।

রবীনকে সে লিখেছে—

"শ্রীচরণেষু,

আমার বোধ হয় যাবার ডাক এসেছে। জানি না, মৃত্যুর আগে আপনার দেখা পাব কি না, তাই এ চিঠিখানা লিখে যাচ্ছি।

যেদিন আপনাকে দেখলাম সেই দিন থেকে এই ভেবে নিদারুণ মর্ম্মপীড়া অনুভব করছি—আপনার যে দুঃখ চোখে দেখলাম, কানে শুনলাম, এ জীবনে তার প্রতিকার করবার সাধ্য আমার নেই।

তাই আমার মৃত্যুর পর আমি দিয়ে যাচ্ছি আপনাকে যৎকিঞ্চিৎ। দয়া করে তা গ্রহণ করবেন, নইলে আমার আত্মার শান্তি হবে না।

বেশী কিছুই নয়, আমার বই কখানা আর সামান্য কিছু কোম্পানীর কাগজ।

ইতি
সেবিকা—
তড়িৎ"

স্থকেশকে যে চিঠি লিখেছিল তড়িৎ, সেটাও স্থকেশ তাকে পাঠিয়েছে। তাতে তড়িৎ লিখেছে যে, স্থকেশ যেন তার লাইব্রেরী আর পাঁচ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ রবীনকে দিয়ে দেয়।

সুকেশ তার চিঠিতে আরও লিখেছে, তড়িতের দেওয়া বইগুলো সে দুই এক দিনের মধ্যেই 'প্যাক্' করে পাঠাবে আর কোম্পানীর কাগজগুলো নাম পাল্টে তার কাছে যথাসময়ে পাঠিয়ে দেবে।

চিঠিগুলি পড়ে রবীনের দুই গণ্ড বেয়ে দরদর ধারে বয়ে গেল অশ্রুর বন্যা—সব ঝাপ্সা হয়ে এল চোখে, শুধু ভাসতে লাগল তার মুগ্ধ-দৃষ্টির সামনে তড়িতের সঙ্গে সেই পনেরো দিন একত্রে কাটাবার সহস্র মনোজ্ঞ চিত্র. আর কুসুম-শয্যায় তড়িতের জীবনের শেষ দৃশ্য!

কলকাতায় তাকে দেখে বিদায়ের সময় তড়িৎ বলেছিল, "আপনাকে দেখে এত দুঃখ পাব, স্বপ্নেও জানতাম না।"

রবীনের মনে হল, কেন সে গিয়েছিল তার দুঃখের বোঝা নিয়ে তড়িতের কাছে? কেনই বা সে বলতে গেল তার কাছে নিজের দুঃখের কাহিনী? সে-ই দুঃখ দিয়ে তড়িতের সুখশান্তি এবং গৌরবময় জীবনের শেষ কটা দিন বিষাক্ত করে দিয়েছে।

তড়িতের এই শেষ দান হাত পেতে নিতে লজ্জায় তার মাথা কাটা গেল।

সে সুকেশকে চিঠি লিখলে—

"তড়িৎ আমাকে যা দিয়ে গেছে তা হাত পেতে নিতে আমার কুণ্ঠায়, লজ্জায় বুক ভরে যাচ্ছে। এ যে আমার শাস্তি! এই শাস্তি থেকে আমি আপনার কাছে মুক্তি ভিক্ষা করছি। আপনি ও-সব রেখে দেবেন, না হয় যাতে লোকের মঙ্গল হয় সেই কাজে তড়িতের নামে দান করবেন। আমাকে আর ও-সব পাঠিয়ে ব্যথা দেবেন না।"

এ চিঠি সুকেশের কাছে পৌছবার আগেই দশখানা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্যাকিং-কেস বোঝাই হয়ে তড়িতের বইগুলো আর কয়েকটা আলমারী ষ্টীমার-ঘাটে এসে পৌছল।

রবীন ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে মাল খালাস করে নিয়ে এল তার কুঁড়ে ঘরে। তড়িৎ চিঠিতে লিখেছিল 'বই ক'খানা,' কিন্তু রবীন দেখলে যে, অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের একটা সম্পূর্ণ লাইব্রেরী। সারা জীবনের প্রচুর উপার্জ্জন থেকে তড়িৎ এগুলো কিনেছিল।

বইগুলো আলমারীতে সাজিয়ে-গুছিয়ে তুলতে গিয়ে রবীন দেখতে পেল তার ভিতর জায়গায় জায়গায় তড়িতের নিজের হাতের লেখা নোট রয়েছে। সেই ছোট ছোট মুক্তার মত লেখার দিকে সে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ ঝাপ্সা চোখে। আরও সে দেখতে পেল কতকগুলো খাতা—তড়িতের নোট-বই। সুন্দর পরিচ্ছন্ন ভাবে লেখা তা, যেন মুক্তার হরফে বোঝাই।

নোটগুলো পড়তে পড়তে তার মনে হল যে, তার ভিতর তড়িৎ অনেক নূতন কথা লিখেছে—তার স্বাধীন চিন্তার ফল। ভারী ইচ্ছা হল তার সেই নোটগুলো শৃঙ্খলাবদ্ধ করে একখানা বই লিখে তড়িতের স্মৃতি স্থায়ী করে রাখতে।

সে এই কাজ করবার জন্যে উঠে-পড়ে লাগল—পড়ে রইল তার নিজের সঙ্কল্পিত গ্রন্থ।

কিন্তু তা করতে গেলে সবার আগে বইগুলো রাখবার একটা সুব্যবস্থা করা দরকার। তার এই জীর্ণ ঘরে এমনি ঠাসাঠাসি করে এগুলো রাখলে এদের অসম্মান করা হবে। তাই সে স্থির করলে একটা পাকা বাড়ী করে এই বই দিয়ে তড়িতের নামে একটা সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করবে।

ভাবতে ভাবতে সে গেল যোগেশের কাছে

যোগেশকে সুকেশের চিঠি দেখিয়ে সে বললে, "যোগেশ, যদি কিছু জমি আর কিছু অর্থ-সাহায্য কর, তবে পাঠাগারটা বেশ ভাল করে করা যায়।"

সুকেশের চিঠি দেখে যোগেশের মনের ভিতরটা কেমন চিড়বিড় করে উঠল। তড়িৎ উইল করে রবীন মাষ্টারকে কিছু দেয় নি। ও সবের উপর রবীন মাষ্টারের কোনও আইন-সঙ্গত অধিকার নেই, তবু সুকেশ স্ত্রীর ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে এ-সব দিয়েছে রবীনকে! আর সে কিনা তার বাবা রবীনকে যে আইন-সঙ্গত অধিকার দিয়ে গেছেন তা থেকে তাকে বঞ্চিত করে রেখেছে! নিজেকে ভারী ছোট মনে হল তার।

একবার ভাবল সব কথা রবীন মাষ্টারকে বলে তার পায়ে জড়িয়ে ধরে তাকে একজিকিউটারী ছেড়ে দিতে অনুরোধ করবে।

কিন্তু সাহস হল না।

অথচ রবীন মাষ্টার যখন তার কাছে সাহায্যের জন্য এলেন, তখন তার ন্যায্য পাওনা টাকা থেকে তাকে বঞ্চিত করতেও তার ভারী কুণ্ঠা-বোধ হল।

তিন-চার দিন ভেবে ভেবে যোগেশ শেষে রবীন মাষ্টারকে বললে, "দেখুন, বাবা দেবত্তোর থেকে বছরে কিছু টাকা লোকহিতের জন্য খরচ করতে বলে গেছেন। তার থেকে হয়ত বছরে তিন চারশ' টাকা আমি দিতে পারি।"

এইটুকু দিয়ে সে তার বিবেককে কোনও মতে ঠাণ্ডা করে রাখলে।

এতেই রবীন মাষ্টার ভারী খুসি হয়ে গেল। সে বললে, "হ্যাঁ ঠিক, জানি আমি—তোমার বাবা আমাকে বলেছিলেন। বেশ ওতেই হবে।"

চমকে উঠল যোগেশ। তার মনে হল, তা হলে উইলের সবটাই জানে রবীন মাষ্টার! তার প্রাণটা আরও আঁৎকে উঠল।

## ১৪

হেডমাষ্টার বললেন, "আচ্ছা খেয়াল মাথায় উঠতে পারে পাগলের। এই অজ-পাড়াগাঁ, একটা কথা বলবার লোক পাওয়াই দায়, বই পড়তে জানেই বা কে? এখানে করতে বসেছে এক প্রকাণ্ড লাইব্রেরী!"

সেকেণ্ড মাষ্টার বললেন, আচ্ছা, বলতে পারেন, বই পড়ে লোকে কি সুখ পায়? পেটের দায়ে বি-এ পাশ করতে অনেকগুলো বই পড়তে হয়েছে, আর এখন পেটের দায়ে পড়ি, যা পড়াতে হয়। যা' পড়েছি, তারই মজুরী পোষায় না—আবার নূতন বই পড়ব! আর ঐ রবীন মাষ্টার দিন-রাত পোকার মত বই নিয়ে বসে পড়ে—যেন কত রস তাতে! হ্যাঁ, বুঝতাম যদি হত ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। বাপ্‌! যে সব বই পড়ে, তার নাম মনে হলে ভির্মি ধরে!"

হেসে হেডমাষ্টার বললেন, "ও একরকম পাগলামি ভায়া, পাগলামি —এই বই-ক্ষেপামি। পাগল না হলে ঐ পারে! দেখতে পাও না, খেলতে যদি যাবে, রবীন মাষ্টার খেলবে কি? দাবা! একেবারে গোঁজ হয়ে ছকের উপর পড়ে থাকে, যেন রাজ্য-পাট তার নির্ভর করছে ওর উপর!"

সুধাংশু বয়সে ছোকরা, এঁদের ঢের ছোট, কিন্তু তাস খেলে এঁদের সঙ্গে। এখন সে গ্রামে এসে বসেছে। তার প্রধান পেশা হচ্ছে সখের থিয়েটার। বছরের অর্দ্ধেক দিন কাটে তার সারা জেলায় ঘুরে ঘুরে থিয়েটার করে।

সে বললে, "মাইরি! রবীন মাষ্টার লাইব্রেরীর ঘরখানা ফেঁদেছে খাসা। প্রকাণ্ড একটা 'হল'—ওতে থিয়েটার হয় চমৎকার! বাড়ীটা হলে ভাবছি, ওখানে একটা নতুন বই প্লে করব।"

সেকেণ্ড মাষ্টার বললেন, "বয়ে গেছে ওর দিতে! বলতে গেলে এমন তাড়া লাগাবে যে, পালাতে পথ পাবে না। যে ভাবে ক্ষেপে রয়েছে পাগল!"

হেডমাষ্টার বললেন, "বাস্তবিক, এই টাকা পাবার পর ওর মেজাজ হয়েছে দেখেছ? যেন লাট! সেই রবীন মাষ্টার, যাকে গাল দিয়ে ভূত ঝেড়ে দিয়েছি, কথাটি বলে নি, এখন তার সঙ্গে কথা বলে কার সাধ্য? একটা কথা বললে দশটা কথা শুনিয়ে দেয়—আর কি চটাং চটাং কথা! অনেক সময় ইচ্ছে হয় দিই কষে দু'ঘা লাগিয়ে।"

সেকেণ্ড মাষ্টার বললেন, "এ শুধু টাকা পেয়ে হয় নি মশায়। ওকে মাথায় চড়িয়ে দিয়েছে ওই যোগেশ। ও যে হঠাৎ রবীন মাষ্টারের ভিতর কি গুণই দেখেছে, আধ মাইল দূরে রবীন মাষ্টারকে দেখলে ছুটে গিয়ে তার পায়ের ধূলো নেয়।"

হেডমাষ্টার বললেন, "তা' বলেছ ঠিক ভায়া। কি হয়েছে বলত? আগে তো যোগেশ এমন ধারা ছিল না! আমার কথায় উঠত বসত, যা বোঝাতাম তাই শুনত। ওর বাপ মারা যাবার পর থেকেই কি যে হয়ে গেছে ওর, তার ঠিকানা নেই।"

সুধাংশু বললে, "আমি জানি। ভুবনবাবু যখন মারা যাচ্ছেন, তখন রবীন মাষ্টার ওকে গাল দিয়ে বলেছিল, 'তুমি কিচ্ছু চিকিৎসা করছ না ওঁর।' তার পর সিভিল সার্জ্জন এসে বললেন, 'ভুল চিকিৎসার ফলেই ভুবনবাবুর ব্যারামটা বেগতিক হয়ে গেছে।' তখন থেকে তার মনটা এমনি হয়ে গেল।"

সেকেণ্ড মাষ্টার বললেন, "না হে না, যোগেশ অত কাঁচা ছেলে নয় যে, এতেই বিগড়ে যাবে। আসল কথাটা আমি আঁচ করেছি! ওর জমির উপর রবীন মাষ্টার করেছে ঐ বাড়ী। দান-পত্র কিছুই হয় নি। বাড়ীখানা তৈরী হয়ে গেলে, গেঁড়া দেবার মতলব।"

হেডমাষ্টার বললেন, "ঠিক বলেছ ভায়া। এই কথাই ঠিক। নইলে এতদিন ঝুলোঝুলি করেও যে যোগেশকে দিয়ে আমি স্কুল বাড়ীর ট্রাষ্ট-ডীড করাতে পারছি না, সে অমনি চাইতেই ফস্ করে লাইব্রেরীর জন্যে জমি দিয়ে ফেল্লে! আবার না কি টাকাও দেবে বলেছে। এ হয়ই না।"

হেডমাষ্টার ছিলেন সেই সুপরিচিত শ্রেণীর লোক, যাঁরা কাউকে হঠাৎ একটা ভাল কাজ করতে দেখলে মনে একটা দারুণ অস্বস্তি বোধ করেন, আর সেই ভাল কাজটার ভিতর একটা বদ্ মতলব আবিষ্কার করতে পারলে সুস্থ বোধ করেন। এ ক্ষেত্রে বদ মতলবের সন্দেহটা বেঠিক নয়, কিন্তু তার স্বরূপ নির্ণয় হল ভুল।

সেকেণ্ড মাষ্টার বললেন, "হ্যাঁ, ভাল কথা, ট্রাষ্ট-ডীডের কতদূর হল? ইউনিভার্সিটি থেকে যে তাড়া দিচ্ছে। না হলে হয়ত নেবে অ্যাফি-লিয়েশান কেড়ে।"

হেডমাষ্টার বললেন, "আমি তো বলেছি যোগেশকে সব কথা। সে মুখে বলে, আজ হচ্ছে, কাল হচ্ছে, কিন্তু টালবাহানা করে কেবলই সময় নিচ্ছে। বলে, উকীলবাবুরা কি সব বাগড়া দিচ্ছেন। এই উকীল জাতটা! ওরা নির্ব্বংশ না হলে কোনও কিছু যদি হয়! যোগেশ সেদিন সব ঠিক করে গেল তার উকীলের কাছে। তিনি শুনেই ঘাড় নাড়তে লাগলেন, বললেন—নাবালক আছে, জজের সার্টিফিকেট চাই। এমনি সব বাজে কথা, কেবল বাগড়া দেবার ফন্দি।"

সেকেণ্ড মাষ্টার বললেন, "কিন্তু যেমন করেই হোক, করে নিন ওটা। নইলে, যোগেশের যা' মতি-গতি দেখছি, কোন্‌দিন বলবে, 'নিকালো'। এই ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় কদিন আর থাকা যায়! ও একবার হুমকি ছাড়লেই তো চাকরীটির দফা-রফা!"

সেই সময় যোগেশকে আসতে দেখে তাঁরা থেমে গেলেন।

যোগেশ এসে একখানা দলিল বের করে হেডমাষ্টারের হাতে দিয়ে বললে, "এই নিন আপনার ট্রাষ্ট-ডীড মশায়। এটা পাকা হল কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। তা হোক, কিন্তু ইউনিভার্সিটিকে দেখাবার পক্ষে যথেষ্ট।"

হেডমাষ্টার উল্লসিত চিত্তে দলিলখানা হাতে নিয়ে বললেন, "বেশ বেশ! একটা দুর্ভাবনা গেল। ইউনিভার্সিটি যে তাড়া দিচ্ছিল!"—বলতে বলতে দলিলখানা খুলে পড়তে গিয়ে তাঁর হাসি মিলিয়ে মুখটি চূণ হয়ে গেল।

ট্রাষ্ট-ডীড করেছে যোগেশ ঠিক, কিন্তু ভয়ানক ব্যাপার! সে লিখেছে 'এই স্কুলের একমাত্র প্রতিষ্ঠাতা রবীন মাষ্টার তাঁহার জীবিতকাল পর্য্যন্ত থাকিবেন একমাত্র ট্রাষ্টী!' আরও সর্ব্বনাশ—সেই ট্রাষ্টীকে দেওয়া হয়েছে অসামান্য ক্ষমতা! দলিলে লেখা আছে—'যদি কোনও দিন কোনও কারণে এ স্কুল না থাকে, অথবা যদি ট্রাষ্টী মহাশয়ের বিবেচনায় স্কুলের কার্য্য রীতিমত ভাবে না চলিতে থাকে, তবে তিনি স্কুলের জমি, বাড়ী খাস দখলে লইয়া সেখানে অন্য কোনও স্কুল বা যে কোনও সাধারণ হিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে পারিবেন।'

মুখ চূণ করে হেডমাষ্টার বললেন, "এটা কি হল?"

যোগেশ বললে "শর্ত্তের কথা বলছেন? উকীলবাবুরা বললেন, ও রকম একটা শর্ত্ত থাকা দরকার, কেন না, তাঁরা বললেন যে, কাল

যদি আপনারা স্কুল উঠিয়ে দিয়ে সেখানে মুদিখানার দোকান কিম্বা থিয়েটারের আড্ডা করেন, তবে কি হবে?"

থিয়েটারের কথা শুনে সুধাংশু উৎকর্ণ হয়ে উঠেছিল। সে বললে, "কেন যোগেশদা,' থিয়েটারটা স্কুলের চেয়ে কম ঠাওরালে? লোক-শিক্ষা, আর্টের শিক্ষা, জীবনের শিক্ষা থিয়েটারে যতটা হয়, স্কুলে তা হয় না।"

যোগেশ হেসে বললে, "আমি ভাই অত শত বুঝিনে, তাঁরা যা বললেন, বললাম।"

শুষ্কমুখে হেডমাষ্টার বললেন, "কিন্তু শুধু তো তাই নয়, 'যদি ট্রাষ্টী মহাশয়ের বিবেচনায় স্কুলের কার্য্য রীতিমত ভাবে না চলিতে থাকে,—' এ কথাটা যে বড় মারাত্মক! আর সে ট্রাষ্টী মশায় হলেন রবীন মাষ্টার! জানেন তো কিছুতেই তাঁর মন ওঠে না।"

"সে কি করব? উকীলবাবুরাই এটা করে দিলেন, আর তাঁরা বলে দিলেন যে, এ বদলাবার অধিকার আমার নেই।"—বলে যোগেশ বললে, "এখন বাড়ী যাই। সদর থেকে সোজা এসেছি আপনার এখানে।"

তাড়াতাড়ি চলে গেল সে।

এরপর হেডমাষ্টার ও সেকেণ্ড মাষ্টার পরস্পরের মুখপানে চাইতে লাগলেন।

হেডমাষ্টার বললেন, "ওহে ভায়া, ত্রিশঙ্কুও যে এর চেয়ে ভাল ছিল! চাইলে বৃষ্টি, এল বন্যা। এখন উপায়?"

সেকেণ্ড মাষ্টার বললেন, "ছিঁড়ে ফেলে দিন না কাগজখানা!"

"আরে, রেজেষ্টারী দলিল, ছিঁড়লে কি হবে?"

অনেকক্ষণ গবেষণার পর হেডমাষ্টার বললেন, "আর একবার রবীন

মাষ্টারকে তোয়াজ করে দেখি, তার কাছ থেকে ট্রাষ্টীগিরি অস্বীকার করে একটা চিঠি আদায় করা যায় কি না।"

সেকেণ্ড মাষ্টার বললেন, "তাতে লাভ হবে কি? সে যদি না হয়, তবে কে হবে?"

"যোগেশ।"

"হয়েছে! তার যে রকম মতিগতি দেখছি, সে তো তার পরদিনই বলবে 'নিকালো'—স্কুলের কাজ রীতিমত চলছে না।"

"তাই তো? এ কি হল বল তো, রবীনের দেখছি একাদশ বৃহস্পতি। ওদিকে সে পেলে একটা ছাত্রীর কাছ থেকে অতগুলো টাকা, আর একগাদা বই! আবার এদিকে স্কুলে সে হয়ে বসল সর্ব্বময় কর্ত্তা!"

"দেখুন অত ভাববেন না। পাগল মানুষ—একাদশ বৃহস্পতি হলেও তার কিছু হবে না। এই দেখুন না, পেলে এতগুলো টাকা, এতগুলো দামী বই! আপনি আমি হলে বইগুলো বেচে কোম্পানীর কাগজ করে খাতির জমা হয়ে বসতাম। ও একখানা বাড়ী করে দিলে সব টাকা উড়িয়ে। এও তেমনি হবে। কাগজখানা চাপা দিয়ে রাখুন না কটা দিন!"

হেডমাষ্টার ভাবলেন, সেই যুক্তিই ঠিক। এখন দলিলটা চাপা দিয়ে রবীন মাষ্টারকে শুধু তোয়াজের উপর রাখলেই সে কিছু টের পাবে না, যেমন চলছে তেমনি চলবে। যোগেশ ঠিক যে যুক্তির ফলে রবীন মাষ্টারকে তোয়াজ করতে আরম্ভ করেছিল, তেমনি অবস্থায় পড়ে এঁরা দুজনও সেই পথই অবলম্বন করলেন।

কিন্তু কাজটা হেডমাষ্টার যত সহজ মনে করেছিলেন, তত সহজ মোটেই হল না।

এর পর যখন রবীন মাষ্টারের সঙ্গে দেখা হল, তখন হেডমাষ্টার

তাকে দূর থেকে নমস্কার করতে করতে তার কাছে গিয়ে একগাল হেসে বললেন, "রবীনবাবু, ভাল আছেন তো?"

এতটা হৃদ্যতায় রবীন মাষ্টার একটু চমকে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর মনে হল নমস্কার করবার কথা। প্রতি-নমস্কার করে সে অবাক হয়ে চেয়ে রইল হেডমাষ্টারের মুখের দিকে।

হেডমাষ্টার বললেন, "আর কত দেরী লাইব্রেরীর বাড়ী হতে?"

রবীন মাষ্টার তেমনি করেই চেয়ে বললে, "ছাত পিটানো হচ্ছে।"

"মস্ত কাজ করলেন আপনি—ঠিক আপনারই যোগ্য! এমন একটা লাইব্রেরী অনেক বড় জায়গায়ও নেই। পণ্ডিত আপনি, আপনারই যোগ্য এ কাজ।"

রবীন মাষ্টার খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে শেষে বললে, "লিখে নিয়ে আসুন মশায়।"

অবাক হয়ে হেডমাষ্টার ভাবলেন, বলে কি এ? একেবারে উন্মাদ পাগল হয়ে গেল না কি? এই সম্ভাবনার কল্পনায় তাঁর মনটা বেশ আশান্বিত হয়ে উঠল।

হেডমাষ্টার বললেন, "লিখব কি মশায়? আপনি বলেন কি?"

রবীন মাষ্টার বললে, "উঁহু, আর আপনার মুখের কথায় ভুলছি নে। এবার থেকে যা বলবার থাকে লিখে দেবেন, তবে জবাব পাবেন। সেই অ্যাসিষ্টাণ্ট হেডমাষ্টারীর কথা মনে আছে তো?"

বেহায়ার শিরোমণি হেডমাষ্টার, নইলে এতদিন রবীন মাষ্টারকে যা নয় তাই করে আজ ফস্ করে এতটা খোসামুদী করতে যেতে বাধত। বেহায়া, তাই এতেও না ভড়কে তিনি বললেন, "দেখুন রবীনবাবু, আপনি মহানুভব লোক। একজন যদি একটা অপরাধ করেই থাকে, তবে সেটা মনে রাখা আপনার মত লোকের উচিত নয়।"

"কিন্তু লিখে আমুন গে।"—বলে রবীন মাষ্টার হন্ হন্ করে চলে গেল।

হেডমাষ্টার বুঝলেন—কঠিন ঠাঁই। সে রবীন মাষ্টার আর নেই। আর হয়ত বা ট্রাষ্ট-ডীডের খবরটা যোগেশ তাকে আগেই বলেছে। তিনি প্রমাদ গণলেন। রবীন মাষ্টার ট্রাষ্টী হলে তাঁর পাততাড়ি গুটোতে হবে বলেই মনে হল।

বাড়ী গিয়ে তিনি খবরের কাগজের কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দেখতে লাগলেন। বিশ বছরের পুরনো সার্টিফিকেটগুলো খুঁজে বের করলেন। অন্ত কাজের দরখাস্ত এখন থেকেই সুরু করা ভাল।

রবীন মাষ্টারকে তোয়াজ করার চেষ্টাটাও চলতে লাগল রীতিমত।

## ১৬

ইতিমধ্যে হঠাৎ ধান-পাটের দর কমতে কমতে এত কমে গেল যে, চাষীদের বেঁচে থাকা হল দায়! মজুরি খেটে যারা দিন চালায়, তাদের মজুরি আট আনা থেকে দু'আনায় নেমে এল, তবুও কাজ মেলে না।

রবীন মাষ্টার তখন লাইব্রেরীর বাড়ী তৈরী নিয়ে মহা ব্যস্ত। তারই তদারক করে সে। বইগুলোর একটা ক্যাটালগ তৈরী করে হাবাতের মত পড়ে সারাদিন।

কিন্তু যখন চাষীদের বিপদ দেখলে, আর শুধু চাষীদের নয়, সঙ্গে সঙ্গে জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী সবাই মরতে বসেছে দেখলে, তখন সে তাদের নিয়ে বৈঠক করে সব কথা শুনে অনেক ভেবেচিন্তে আবার একটা স্কীমও তৈরী করলে।

তার স্কীমের ভিতর আগের মত যৌথ-আবাদের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু

এবারে সে আরও গভীরভাবে আলোচনা করে দেখতে পেল যে শুধু তাতেই হবে না, দেনা ও খাজনার বোঝা না কমাতে পারলে সবই ব্যর্থ হবে।

তাই তার নূতন স্কীমে সে এই ব্যবস্থা করলে যে, জমিদার, মহাজন, চাষী, মধ্যস্বত্ববান—সবাইকে নিয়ে একটা সোসাইটি হবে। জমিদার-মহাজন, চাষীদের মতই লাভের অংশ পাবেন ডিভিডেণ্ড স্বরূপ। আর যাঁর যত টাকা প্রজার কাছে পাওনা আছে, তার অর্দ্ধেক টাকার শেয়ার তাঁদের প্রত্যেককে দেওয়া হবে।

স্কীম করে সে প্রজাদের বোঝালে। তারা এবার সহজেই তার প্রস্তাবে সম্মত হল। তারপর সে গেল মহাজনদের কাছে। তাঁরা তাকে পাগল বলে চিরদিন যেমন উড়িয়ে দেয়, তেমনি উড়িয়ে দিলেন।

এমন সময় এল এক মৌলবী সাহেব। তার বক্তৃতা শুনে চাষীদের মধ্যে যারা একটু উগ্র মেজাজের, তারা ভাবতে লাগল তাদের লাঠির কথা! যারা মাঝারি, তারা ভাবলে ধর্ম্মঘটের কথা, আর ঠাণ্ডা সুস্থির যারা, তারা ভাবলে কথাটা তো ঠিক—কিন্তু করা যায় কি? সংখ্যায় তারাই অবশ্য বেশী।

এই শেষ শ্রেণীর কতকগুলি লোকের মনে পড়ল যে, মৌলবী সাহেব যে কথাগুলি বললেন, অনেক আগে এর অনেক কথা তারা শুনেছিল রবীন মাষ্টারের কাছে। তারা ভাবলে যে, কর্ত্তব্য স্থির করবার আগে একবার রবীন মাষ্টার কি বলে, সে কথাটাও শোনা যাক।

তাদের কয়েকজন এল রবীন মাষ্টারের কাছে। কথাটা তার কাছে তুলতেই রবীন মাষ্টার বললে, "ভাই সব, আমার কাছে ও কথা তোলা মিথ্যে, আমি কিছুই করতে পারব না তোমাদের। চেষ্টা তো করেছি অনেক, কিন্তু আমি অক্ষম।

অছিম মণ্ডল বললে, "কিন্তু মৌলবী সাহেব যা বলেন, সে কথাটা আপনি কেমন বোঝেন? আমরা সবাই যদি জোট করি? দেব না খাজনা, দেব না মহাজনের টাকা।"

রবীন মাষ্টার বললে, "একখানা গ্রাম বা দশখানা গ্রামের লোক মিলে জোট করলে কিছুই হবে না। হ্যাঁ, সমস্ত দেশের চাষী যদি জোট করতে পার,—কিন্তু সে মস্ত বড় কথা। এক জায়গার লোকে ধর্ম্মঘট করলে হবে শুধু হাঙ্গামা, ধর-পাকড়, আইন-আদালত। ফলে শেষে কিছুই দাঁড়াবে না।"

এই সব কথা বুঝিয়ে সে বললে, "তোমাদের এখনকার বড় শত্রু জমিদার-মহাজন নয়, তার চেয়ে বড় শত্রু দারিদ্র্য। তার সঙ্গে লড়ে, পাল্লা দিয়ে জমিদার, মহাজন, চাষী—সবাই মিলে যদি একটা ব্যবস্থা করতে পারে তবেই বাঁচবে। নইলে এই সঙ্কটের সময় জমিদার, মহাজন আর চাষীতে লাঠালাঠি করে সেই আসল সংগ্রামে কেবল শক্তি-ক্ষয় হবে—কিছুই হবে না, মরবে সবাই।"

খুব জোরে ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিতে দিতে তারা উঠে গেল।

তাদের নিজেদের বৈঠকে তারা নিজেদের আর্থিক দুর্গতির আলোচনা করলে আর অপরকে বোঝালে। উগ্রেরা মোটেই বুঝল না, মাঝারিরা বললে যে, রবীন মাষ্টারের সব কথা মেনে নিলেও তার উপদেশ অনুসারে কেউ যখন কাজ করবে না, তখন ও নিয়ে আলোচনা মিথ্যে।

অবস্থা সঙ্গীন হয়েই রইল।

কিন্তু রবীন মাষ্টারের তাতে কোনও উদ্বেগ হল না। সে পড়তে লাগল, লিখতে লাগল আর লাইব্রেরীর বাড়ী পরিদর্শন করতে লাগল—যেন গ্রামে কোথাও কিছুই হয় নি।

মহকুমা থেকে সাব-ডিভিশন্যাল অফিসার এলেন,—এক ছোকরা সিভিলিয়ান। তিনি জমিদার-মহাজন প্রজা-মাতব্বরদের কাছে সব কথা শুনলেন। সবার মুখেই রবীন মাষ্টারের কথা। সবাই অল্প-বিস্তর বোঝালে তাঁকে, রবীন মাষ্টার ইচ্ছা করলেই একটা আপোষ করে দিতে পারে, কিন্তু করবে না। শুনলেন যে, রবীন মাষ্টারই চাষীদের মাথায় এই সব খেয়াল গোড়ায় ঢুকিয়েছে।

হাকিমের ধারণা হল রবীন মাষ্টারই প্রজাদের ক্ষেপিয়েছে এবং ক্ষেপাচ্ছে। তাকে শাসন করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

শাসন করবার জন্যে তিনি রবীন মাষ্টারকে ডেকে পাঠালেন। তার সঙ্গে আলাপ করে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। যা তিনি ভেবেছিলেন, তা সে মোটেই নয়।

সব কথা শুনে হাকিম বললেন, "আপনি আপনার প্ল্যান ঠিক করে আমাকে দিন, আমি সবাইকে তাতে রাজী করতে পারি কি না দেখি।

অনেক দিন পরে আবার রবীন মাষ্টারের মনে আশা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পরম উৎসাহে সে তার নতুন স্কীম লিখতে বসল। এতদিনে বুঝি তার স্বপ্ন সফল হবে, জীবন সার্থক হবে। আনন্দে বিভোর হয়ে উঠল সে।

## ১৭

লাইব্রেরী বাড়ী তদারকীর কাজে সারাদিন খেটে খেটে সেদিন বিকেলে রবীন ভারী ক্লান্তি বোধ করল। অন্যমনস্ক ভাবে ভাবতে ভাবতে বিকেলের দিকে চলে গেল জমিদার বাড়ীতে। সোজা ঢুকল গিয়ে ভুবনবাবুর সেই বসবার ঘরে। কুলুঙ্গির উপর দাবা নেই দেখে

একটু বিস্মিত হয়ে পিছনে চেয়ে দেখলে ভুবনবাবু যেখানে বসতেন, সেখানে বসে আছে যোগেশ।

"ও—ভুল হয়ে গেছে।"—বলে সে এসে যোগেশের কাছে বসল।

ভুবনবাবু যে অনেক দিন হল মারা গেছেন, এ কথাটা বিস্মৃত হওয়ায় সে ভারী আত্মগ্লানি বোধ করছিল।

যোগেশ তখন ভারী দুশ্চিন্তায় বিব্রত হয়ে বসে ছিল। সে কোনও কথা বললে না!

রবীন মাষ্টার অনেকক্ষণ বসে থেকে বললে, "যোগেশ, একটা কথা তোমায় না বলে পারছি নে। আমি যে মনে মনে তোমায় কত সাধুবাদ করি তা বলে শেষ করতে পারি নে। তোমার চরিত্রের মত চরিত্র বড় একটা তো দেখতে পাই নে।"

যোগেশ খোসামুদি পেতে অভ্যস্ত। সে এতে বেশী বিচলিত হল না। সে একটু হেসে এ প্রশংসা মাথা পেতে নিলে।

রবীন মাষ্টার মৃদুস্বরে বললে, "আমি বলছি তোমার বাবার উইলের কথা। তিনি তাতে তোমায় অর্দ্ধেক সম্পত্তি দিয়ে গেছেন, কিন্তু ভাইদের প্রতি স্নেহবশে তুমি সে সুবিধা ত্যাগ করেছ—এ দেখে আমি তোমাকে কি মহৎ যে মনে করছি, তা বলতে পারি নে।"

এ কথায় যোগেশের অন্তর চমকে উঠল। রবীন মাষ্টার সব জানে তা হলে! তার এত লুকোচুরী সবই মিথ্যে! যা হোক, সৌভাগ্য তার যে, রবীন মাষ্টার এ লুকোচুরীর ভুল অর্থ করেছে!

কিন্তু আশ্চর্য্য হল সে এই ভেবে যে, রবীন মাষ্টার সব জেনে-শুনে উইলের অধিকার নেবার জন্যে একদিনের তরে চেষ্টা করে নি!—হায় রে! ওকে লোকে ভাবে পাগল!

যোগেশের মাথা নত হয়ে পড়ল ভক্তিতে। সে গদগদ কণ্ঠে

বললে, "আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আপনার এ প্রশংসার যোগ্য হতে পারি।"

'হো-হো' করে হেসে রবীন বললে, "সে হবে তুমি, হবে। আমার কোনও সন্দেহ নেই।"

ডাকঘর থেকে যোগেশের লোক গিয়ে চিঠি নিয়ে এসেছিল। রবীন মাষ্টারের একখানা চিঠি ছিল।

অনেক দিন পরে ব্ল্যাক সাহেবের চিঠি পেয়ে ভারী উল্লসিত হয়ে উঠল সে।

তিনি লিখেছেন কলকাতা থেকে—

"এতদিন পরে আমি আপনাকে অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষিত সুসংবাদ দিচ্ছি। এখানে আপনার ঠিক মনের মতন একটা চাকরীর জোগাড় করেছি। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে ২০০৲ টাকা মাইনের একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হবেন জেনে, আমি অনেক চেষ্টা করে আপনার জন্যে সে চাকরী ঠিক করেছি। তিন মাসের জন্যে শিক্ষানবিশী করতে হবে। সে ক'মাস পাবেন ১০০৲ টাকা করে। তারপর দুশ' টাকা হবে। আশা করি, আপনি এ সংবাদে সুখী হবেন। এই সঙ্গে আপনার নিয়োগপত্র পাঠালাম।"

চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল রবীন মাষ্টার! আনন্দে তার দৃষ্টি অন্ধ হয়ে এল। হাত কাঁপতে লাগল থর্‌থর্‌ করে। নিয়োগপত্রখানা সে খুলে দেখলে। তারপর যোগেশকে পড়ে শুনিয়ে বললে, "যোগেশ, যোগেশ, দেখ, দেখ, কি সৌভাগ্য আমার!"

যোগেশও চিঠিখানা পড়ে ভারী খুসী হল।

আনন্দে মশগুল হয়ে রবীন মাষ্টার বাড়ী চলল। এতদিনে তার জীবন-ভরা সাধনা সব দিক দিয়েই সার্থক হতে চলেছে। ২০০৲ টাকা

মাইনের চাকরী !—কলকাতায় !!—ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে !!!—সেই মহামূল্য পুস্তক-সম্ভারের মাঝখানে ! কত সুযোগ সে পাবে পড়বার। কি আনন্দে কাটবে তার জীবন পণ্ডিতদের সঙ্গে কথা কয়ে !

এতখানি সফলতা জীবনে সে কোনও দিন আশা করতে ভরসা করে নি।

চলতে চলতে তার মনে হল—হায় রে, এমন দিনে তড়িৎ নেই। থাকলে কি আনন্দ হত তার ! তড়িৎ নেই—তার দরদী সমঝ্দার বান্ধব কেউ নেই আজ, যাকে এ আনন্দের ভাগ দিয়ে সে সুখী হতে পারবে ! আর কে বুঝবে এ সৌভাগ্য কতখানি ? নিস্তারিণী ? সে দেখবে শুধু ঐ দুশ' টাকা—আর কিছুই বুঝবে না।

তড়িতের জন্য নতুন করে হাহাকার করে উঠল তার প্রাণ। শুধু তড়িৎ নেই বলে এ পৃথিবী আজ বড় শূন্য লাগল তার।

পথে যেতে পড়ল তড়িতের স্মৃতি-মন্দির—তার সঙ্কল্পিত লাইব্রেরীর-বাড়ী।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। শুক্লা-অষ্টমীর চাঁদের আলো ঝিক্‌মিক্‌ করছে সেই বাড়ীর ভারার বাঁশের উপর। সেই ঝিক্‌মিক্‌ আলোর সঙ্কেতে যেন ইসারা করে ডাকলে রবীনকে।

রবীন গেল সেই লাইব্রেরীর বাড়ীর কাছে। ভারার সঙ্গে যে বাঁশের সিঁড়ি ছিল, তাই বেয়ে উঠে গেল সে ছাদে। ছাদ পেটা আজ শেষ করে মিস্ত্রী-মজুরেরা বাড়ী চলে গেছে।

সেই ছাদের উপর ঘুরে ঘুরে রবীন কেবলি ভাবতে লাগল তড়িতের কথা। আজ তার মনে হল, তড়িৎ না থাকায় আজ জীবনের সায়াহ্নে তার এই সৌভাগ্য হয়ে গেছে অর্থ হীন। হায় ! কেন গেল তড়িৎ ?

যদি বেঁচে থাকত সে আজ তার সৌভাগ্যের, আনন্দের ভাগ নিতে। হায়! কেন গেল তড়িৎ?

ভাবতে ভাবতে অভিভূতের মত ছাদের উপর এলো-মেলো পদচারণা করতে লাগল। ছাদের সিঁড়ি তখনও তৈরী হয়নি। সিঁড়ি তৈরীর জন্য ছাদের খানিকটা জায়গা ফাঁকা রাখা হয়েছিল। ম্লান জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলোয় ভুল করে রবীন সেখানেই করল পদক্ষেপ। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে মুখথুবড়ে পড়ল সে নীচে ইঁটের স্তূপে।

পরদিন সবাই আবিষ্কার করল তার প্রাণহীন দেহটা।

ভুলই সে করে গেছে চিরদিন। তার সেই ভুলে ভরা জীবনের সমাপ্তি হল পদক্ষেপের এই শেষ ভুলে।

সমাপ্ত